আরোহী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক ঃ
বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রকাশনায় ঃ
শ্রীমতী বিশখা বিশ্বাস
চিকনপাড়া, ঠাকুরনগর, ২৪-পরগণা

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীপঞ্চানন মালাকার

মুদ্রণে ঃ
শ্রীঅধীর বিশ্বাস
বর্ণালী প্রিন্টার্স
মছলন্দপুর, ২৪-পরগণা।

আরোহী

'আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। পালকি প্রস্তুত?'

উত্তর কে দেবে! সকলেই নীরব। পরিবার, পরিজন, সাতপুত্র কারো মুখে কোনো কথা নেই।

ব্রজবিনোদ রায় আবার প্রশ্ন করলেন, 'পালকি কি তৈরি হয়েছে?' মৃদু মৃদু হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনি কানে আসছে। বাইরে আজ প্রখর রোদ। এবারে গ্রীষ্মের উত্তাপ অতি ভয়ঙ্কর। তামাটে আকাশের কোথাও একছিটে মেঘ নেই। বড় বড় গাছ সব ঝিম মেরে আছে। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল প্রকৃতির কাছে জল চেয়ে কাতর। গরম বাতাসে দূর প্রান্তরে গেরুয়া ধুলো গাজনের সন্ন্যাসীর মতো মাঝে মাঝে নেচে উঠে আলোর পথে সহসা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পাতার ছায়ায় ক্লান্ত পাখি। ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে আছে।

তোমরা আর দেরি করো না। আমি তাহলে খেয়া ধরতে পারব না। এ যাওয়া চির যাওয়া। ফিরে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ এখন যাবেন। তাঁর ডাক এসেছে।

অতীতের পথে এই বংশকে অনুসরণ করলে আমরা পৌঁছে যাব আরঙ্গজীবের সেই ভয়ঙ্কর রাজত্বকালে। তটস্থ ভারতে। সেখানে খুঁজে পাব এই বংশের এক আদি পুরুষকে, তাঁর নাম পরশুরাম। এক সাত্ত্বিক সদ্‌ব্রাহ্মণ।

আরঙ্গজীব এক আজব রাজা। চোদ্দ বছর বয়েসেই তিনি 'বাহাদুর'। ভারতজোড়া খ্যাতি। ১৬৩৩ সালে পেছিয়ে যাই। তারিখটা ২৮ মে। যমুনার তীর। আগ্রা ফোর্ট। তেমনি গরম। কোথাও জল নেই। শীর্ণ যমুনা ছল ছল করছে রোদসীর চোখের মতো।

সম্রাট সাজাহানের হঠাৎ ইচ্ছা হল, এমন একটা দিনে হাতীর লড়াই দেখলে কেমন হয়! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম নিয়ে এস 'সুধাকর' আর 'সুরাট-সুন্দর'-কে। এসে গেল বিশাল দুই গজসুন্দর। রণক্ষেত্র—যমুনার সমতট। শৃঙ্খলমুক্ত হাতী দুটি প্রথমে খানিক ছোটাছুটি করে, একজন আর একজনকে জাপ্টে ধরল। শুরু হল দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

আগ্রা দুর্গের অলিন্দ, যেখানে প্রতি সকালে সম্রাট উদিত হন অভিবাদন

গ্রহণ-অনুষ্ঠানে। লড়াই করতে করতে হাতি দুটো তার তলায় এসে হাজির। প্রচণ্ড সমর। শুঁড়ে শুঁড়ে, দাঁতে দাঁতে সঙ্ঘর্ষ। পায়ের আঘাতে কুদলে যাচ্ছে তটের বালি।

সম্রাট ত্বরিতে এলেন সেই অলিন্দে। মহাসমর। মহা আগ্রহে দেখছেন। নিচে সম-ভূমিতে অশ্বারোহী তাঁর তিন সাবালক পুত্র। কনিষ্ঠ আরঙ্গজীবও অশ্বপৃষ্ঠে। তার আগ্রহ সর্বাধিক। এগিয়ে গেছে রণস্থলের অতি কাছে।

লড়াই চলছে। ধুন্ধুমার দুই পক্ষ। সুধাকর যেন অতিশয় ক্ষিপ্ত। দুটি হাতি হঠাৎ পরস্পরের থেকে সামান্য সময়ের জন্যে বিচ্ছিন্ন হল। সুরাট-সুন্দর বোধ হয় রণে ভঙ্গ দিতে চাইছে। সরে গেছে এক পাশে। সুধাকর তখন ভীষণ লড়াইয়ের মেজাজে। প্রতিপক্ষকে দেখতে না পেয়ে শুঁড় উঁচিয়ে তেড়ে এল বালক আরঙ্গওজীবের দিকে।

অশ্বারোহী বালক সামান্যতম বিচলিত হল না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আছে, যাতে সে পালাতে না পারে। হাতির মাথা লক্ষ করে বল্লম ছুড়ল। হাতি তখন আরও ক্ষিপ্ত। শুঁড়ের ঝাপটায় আরঙ্গজীবকে ঘোড়া থেকে ছিটকে ফেলে দিল।

মহা হইচই। আমির, ওমরাহ, ভৃত্যকুল ছোটাছুটি করছে। দুম-দাম বাজি ফাটানো হচ্ছে। শব্দ, ধোঁয়া। সুধাকর আদৌ ভীত নয়। সম্রাটের শ্রেষ্ঠ রণহস্তী সম্রাটের কনিষ্ঠপুত্রের প্রাণ সংহারে ছুটে আসছে।

ভূমি থেকে তুরন্ত লাফিয়ে উঠেছে আরঙ্গজীব। হাতে কোষমুক্ত তরোয়াল। সামনে যমদূতের মতো উন্মাদ এক হস্তী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুজা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন ভিড় আর ধোঁয়া ঠেলে। ঘোড়া এক ঝটকায় তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। রাজা জয় সিংহ ছুটে আসছেন বালকের প্রাণরক্ষায়।

দিল্লির সিংহাসন যার অপেক্ষায় মৃত্যু কি তাকে বরণ করতে পারে? ভারতের ভবিতব্য যে তাহলে অন্যরকম হয়! রক্ষক এগিয়ে এল অন্য দিক থেকে। সুরাট-সুন্দর ছুটে এল রণক্ষেত্রে। যুদ্ধে তার মতি ফিরেছে আবার। বল্লমের আঘাতে আহত, বাজির শব্দে ও ধোঁয়ায় বিপর্যস্ত সুধাকর তখন পালাতে ব্যস্ত। বিকট শব্দে তাড়া করেছে সুরাট-সুন্দর।

পুত্র পিতার বাহুবন্ধনে। 'শাবাশ', 'শাবাশ'। সমবেত উল্লাস। 'তুমি বাহাদুর'। 'বাহাদুর' উপাধি পেল চতুর্দশ বর্ষীয় বালক আরঙ্গজীব। ওমরাহরা সসম্ভ্রমে সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'বাপকা বেটা! মনে পড়ে সম্রাট, আপনার পিতা জাহাঙ্গীরের সামনে, আপনার যৌবনে খোলা তরোয়াল হাতে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন!'

স্নেহপরায়ণ পিতা পুত্রকে স্নেহের তিরস্কার করছেন—এতটা দুঃসাহস কি ভাল! আরঙ্গজীব বললেন, এই যুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে লজ্জার কিছু ছিল না পিতা। মৃত্যুর যবনিকা সম্রাটের ওপরও নেমে আসতে পারে। তাতে অসম্মানের কিছু নেই। যুদ্ধটাই বড় কথা, পরাজয়টা নয়।

১৫ জুন, ১৬৫৯, আরঙ্গজীব সম্রাট হয়ে ময়ূর সিংহাসনে বসলেন। ভারতসম্রাট। সে এক বিশাল সমারোহ। দিওয়ান-ই আম। মুক্তোর মালা আর মণি-মানিক্যখচিত স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত রাজসভা। মেঝে দামী কার্পেটে আবৃত। স্তম্ভ আর ভেতরের ছাত ভেলভেটে মোড়া। তার ওপর ফুলকারি রেশমি কাপড় আর সোনার জরি, রুপোর তবক। দরবার কক্ষের উঠানে খাটানো হয়েছে বিশাল তাঁবু। চতুর্দিকে লাগানো হয়েছে জেল্লাদার রুপোর চাকতি। সোনা আর রুপোর ধূপদানীতে জ্বলছে সুগন্ধী ধূপ। জ্বলছে মুসব্বর। অপূর্ব সুবাস।

অতি মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত আমিররা সারি সারি দণ্ডায়মান। সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কুর্নিসে নতমস্তক দরবার। স্তুতি পাঠ ওস্তাদরা শুরু করলেন সংগীত। সুন্দরী নর্তকীদের নৃত্য। রাজপুরুষদের পান বিতরণ করা হল। থেকে থেকে আতরের ফুরফুরি।

সম্রাটের নামে খুতবা পড়া হল। চালু হল নতুন মুদ্রা। সেই মুদ্রার লেখা,

পৃথিবীতে চালু হল মুদ্রা
পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল,
বিশ্ব বিজেতা সম্রাট আরঙ্গজীব
এর উদ্গাতা।।

পিতা সাজাহান বন্দী। সহোদরদের নির্বিচার হত্যা। সর্বাধিক প্রিয় পুত্র, সিংহাসনের দাবিদার দারার ছিন্নমুণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পিতা সাজাহানের খানা-টেবিলে। আরঙ্গজীবের আদেশ সুদৃশ্য আধারে, সুদৃশ্য আবরণে রেখে এস পিতার খাদ্যসম্ভারে স্নেহের পুত্রের ছিন্ন শির। মৃতের ভাষাহীন চোখে স্থির হয়ে আছে মত্যুকালীন আতঙ্ক। স্নেহের কন্যা জাহানারা আবরণটি সরান মাত্রই ...

ভ্রাতার সুব্যবস্থাপনায় দারার হত্যাকাণ্ড হত্যার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। অতুলনীয়। দারা ধৃত হলেন। সেও এক বিশ্বাসঘাতকতা। আরঙ্গজীবের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে তাঁর পরাজয়, সেও তো বিশ্বাসঘাতকতা। দারাপুত্র সিপির শুকোকে নিয়ে পালাচ্ছেন। প্রথমে এলেন গুজরাট। আমেদাবাদ নিরাপদ নয়। পতন হয়েছে গুজরাটের। কোলি দস্যুরা দারার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। দারা কচ্ছে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলেন। প্রত্যাখ্যান। যুবরাজ দারাকে কেউ আশ্রয় দেবে

না। কোথায় যাবেন? শেষ নিরাপদ আশ্রয় কোন দেশে!

কোনো পরামর্শদাতা নেই। যারা একদা বিশ্বস্ততার ভান করত তারা বিত্ত, বৈভব, খেতাবের লোভে আরঙ্গজীবের শিবিরে। সঙ্গে পুত্র সিপির শুকো, নাদিরা ও অন্যান্য কয়েকজন বেগম।

দারা পলায়নের একটি দুরূহ পথ বেছে নিলেন। বোলান পাস দিয়ে কান্দাহার। সেখান থেকে পারস্য। কান্দাহার থেকে কাবুলও যাওয়া যেতে পারে। আর একবার শেষ চেষ্টা, যদি ভারতে ফেরা যায়! ভাগ্যদেবী যদি প্রসন্না হন। আফগানিস্তানের যোদ্ধা উপজাতীয়দের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। দারা আফগানিস্তানের শাসনকর্তা মহাবৎ খানের সাহায্য চাইলেন।

মনে পড়ল আর একজনের কথা। মালিক জিওয়ন। এই লোকটিকে দারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সাজাহান হুকুম দিয়েছিলেন, বদমাইশটাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে দাও। থেঁতলে মেরে ফেলুক। দারা পিতার উপর তাঁর প্রভাব খাটিয়ে প্রাণদণ্ড মুকুব করিয়েছিলেন। প্রাণদাতার প্রতি তার একটা কৃতজ্ঞতা থাকবে না!

জিওয়নের শরীরে তুর্কি আর ইহুদী রক্তের মিশেল। তিনি দারাকে আশ্রয় দিলেন। নাদিরা বানু কোনও দিন দারার কাছছাড়া হননি। তিনি দীর্ঘদিন আমাশয়ে ভুগছিলেন। তিনি চিরবিদায় নিলেন।

মালিক জিওয়ন এক ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনদাতাকে সাদর অভ্যর্থনায় নিজের রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন। এই আশ্রয়ে দারা নাদিরা বানুর মৃত্যুতে দুদিন শোক পালন করলেন। তৃতীয় দিন দারা ও সিপির কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে বোলান গিরিপথের দিকে এগোলেন। দুর্গম গিরিপথ পেরোতে পারলেই কান্দাহার। কান্দাহার থেকে পারস্য। দারারই রচনা,

রাজাগিরি সহজ, নিজেকে মানিয়ে নাও দারিদ্র্যের সাথে।
বিন্দু যদি সিন্ধু হতে পারে তবে মুকুতা হয়ে লাভ কী বলো?

দারার পরিধানে সামান্য একটি পোশাক। নগণ্য একটি পাগড়ি। কোনো বৈভব নেই। প্রিয় পুত্রকে সাজাহান প্রচুর দিয়েছিলেন। সবই গেছে। চলে গেছে প্রিয় জীবনসঙ্গিনী নাদিরা বানু। এখন প্রাণটুকু সম্বল। দারাই না লিখেছিলেন,

যাত্রী সাথে যতো কম থাকে তার
ততো সে নিরুদ্বিগ্ন চলার পথে
তেমনি এই পৃথিবীতে তুমিও তো যাত্রী এক
মনে রেখো সেই সতর্কবাণী

ধন যতো হবে বাড়বে শুধু অতৃপ্তি
পাগড়িতে যত পাক দেবে ভারি হবে তা।

রাস্তার মোড়েই অপেক্ষা করে ছিল দারার ভাগ্য। মালিক জিওয়ন ও তার ভয়ঙ্কর অনুচরেরা দারা ও সিপিরকে ঘিরে ফেলল। দারা অবাক। দারা হতভম্ব। মোগলদের ভারতবর্ষ খুনী আর বিশ্বাসঘাতকে ভরা, তবে এ যেন বড় আকস্মিক!

দারা সামান্যতম বাধা দিলেন না। সিপির কিছুক্ষণ লড়াই করলেন। শৃঙ্খল প্রস্তুতই ছিল। সিপিরের দুটি হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হল। শৃঙ্খলিত হলেন দারা। দারা এইবার প্রতিবাদ করলেন, 'জিওয়ন মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। একদিন আমিই তোমার প্রাণ বাঁচিয়ে আমার ভাগ্য তৈরি করেছিলুম। একটা কথা জেনে রাখ, মোগল রাজবংশের কোন শাহজাদার হাত কেউ পিছমোড়া করে বাঁধে না।'

মালিক জিওয়ন এক মুহূর্ত ভাবলেন। হুকুম দিলেন, খুলে দাও সিপিরের হাত। বন্দীরা যথাসময়ে পৌঁছে গেলেন দিল্লিতে। পুরস্কৃত হলেন নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক। আরঙ্গজীব তাঁকে করলেন হাজারী মনসবদার। উপাধি দিলেন, 'বক্তিয়ার খাঁ'। আরঙ্গজীব বলতেন, ইনসান তো আল্লার পুতুল। সব চক্রান্তের মালিক খোদা। দুনিয়াদারিতে তাঁর চেয়ে বড় চক্রান্তকারী আর কে আছে!

দিল্লির রাজপথের দুপাশে সেদিন হাজার হাজার মানুষের ভিড়। বারান্দায়, ছাতে। মানুষ পড়ে না যায়! বর্ণাঢ্য সামরিক শোভাযাত্রা। একটা মাদী হাতি। শীর্ণ। যে কোনো দিন শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাবে। বহুদিন চান করানো হয়নি। সারা গায়ে দুর্গন্ধী ময়লা। হাতির পিঠে বসানো হয়েছে দারা ও পুত্র সিপিরকে। হাতির সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে দুজনের পা। বন্দীদের পরানো হয়েছে মোটা কাপড়ের ছেঁড়া পোশাক। মাথায় নোংরা ছেঁড়া পাগড়ি। অতি শস্তা কাশ্মিরী শাল। দরিদ্ররা যা ব্যবহার করেন।

আরঙ্গজীবের আদেশে এই মিছিল নগরপরিক্রমায় বেরিয়েছে। ঝকমকে পোশাকে সৈন্যবাহিনী। তার মাঝে অথর্ব হাতির পিঠে রাজকীয় অপমান। হাতির লেজের কাছে খোলা তরোয়াল হাতে নজর বেগ। আরঙ্গজীবের এই বিশ্বস্ত বান্দাটিকে সবাই বলে পোষা কুকুর। বন্দীরা প্রথম থেকেই এর হাতে। হাতির একপাশে চলেছে অশ্বারোহীর দল। মালিক জিওয়ন ও তার আফগান অনুচরেরা। কদম, কদম। সেনাদের বর্মের ইস্পাতে রোদ ঝলসাচ্ছে। উদ্যত হাতে খোলা তরোয়াল। তরোয়ালের ডগায় রোদের ঝিলিক। নিষ্ঠুরতার কি

নৈসর্গিক ছটা। অপর পাশে অশ্বারোহী আর একটি দল। তীরন্দাজ বাহিনী। লাহোরি গেটের ভিতর দিয়ে এই নারকীয় মিছিল চলেছে দিল্লির দিকে।

এই অঞ্চলে দারার জনপ্রিয়তা অসীম। তাঁর বিচরণভূমি। উদার এক বাদশাহ! যাঁর মনে ধর্মভেদ নেই। হিন্দু, মুসলিম সব সমান। এই শোনো! তোমাদের মৌলবাদের কোনো দাম নেই। ঈশ্বর বহু হতে যাবেন কোন দুঃখে। তিনি 'এক'।

বন্ধু! এখানে রয়েছে তৌহিদের রহস্য,
বোঝো তাকে
কোথাও কিছু নেই ঈশ্বর বিনা
তাঁকে ছাড়া যা কিছু দেখো, জানো
সব যে তাঁরই নাম,
এক ঈশ্বরের সৌরভে সুবাসিত সব।

দারা আর দেবদূতের মতো সুন্দর পুত্র সিপির। জীর্ণ পোশাকে কুৎসিত হাতির পিঠে শৃঙ্খলিত। পথের দু'ধারের মানুষ অশ্রুমোচন করছেন। দারা লজ্জায় মাথা তুলতে পারছেন না। অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল নয় কি? তরুণ বয়সে ছোট্ট একটি বই লিখেছিলেন। কয়েকটি কবিতা। বইটির নাম, 'তরিকৎ-উল-হকিকৎ'। তারই একটি কবিতার কয়েকটি লাইন কি মনে ভাসছে!

তুমি বিরাজিত আলোয় আর পতঙ্গের মাঝে,
আছ মিশে সুরারও সাথে, শুধু অমৃতে নয়।
পীর, পণ্ডিত, মূর্খ, পাপী প্রতি দেহে তুমি একই খোদা।

দারা মনে মনে হাসছেন। কোন শক্তিতে সেই বয়সে লিখতে পেরেছিলেন এমন ভবিষ্যত-সূচক এই লাইন,

তোমাকে যে ভালবাসে কখনো বা তাকে পাঠাও জল্লাদের কাছে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভিখারি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠল, 'হায় দারা! আপনি যখন প্রভু ছিলেন, তখন আমাকে কত ভিক্ষে দিতেন! আজ যে আপনি কিছুই দিতে পারবেন না তা আমি জানি।'

দারা ভিখারির দিকে একবার তাকালেন। গায়ের সেই হীন চাদরটি খুলে ছুড়ে দিলেন তার দিকে। সেটি পরীর মতো ডানা মেলে অশ্বারোহীদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বাতাসে। দারার শেষ দান।

ক্ষিপ্ত দর্শকরা মালিক জিওয়ন ও তাঁর বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর, নোঙরা হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ছুড়ে ছুড়ে মারছে। এক বিদেশি এই

ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ফরাসি চিকিৎসক বার্নিয়ের। তিনি লিখেছেন, 'শহরের মানুষ অকথ্য ভাষায় আরঙ্গজীবকে গালাগাল দিচ্ছে। লোকটা মানুষ, না নরপিশাচ! এমন একজনও মানুষ দেখছি না, যার চোখে জল নেই, কণ্ঠে হাহাকার নেই।'

চাঁদনি চক, সাদুল্লাখানের বাজার ঘুরে মিছিল শেষ হল খিজিরাবাদ বাগানে। সেখানে নজরবেগের পাহারায় বন্দীরা রইলেন খাওয়াসপুরা ভবনে। এক বাহিনী সেনা ঘিরে রাখল সেই ভবন। দারাকে সবাই ভালবাসে। জনপ্রিয়। সে ভালবাসা এতটা! গৃহযুদ্ধ বেধে যায় আর কি! এইরকম গণবিক্ষোভ! সভা ডাক। মন্ত্রণা সভা। গভীর রাত। আগস্ট মাস। শীত এখনো তিন মাস দূরে। শুকনো গরমে দিল্লির অবস্থা পাঁপর ভাজার মতো। সকালের মিছিলের উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে সারা শহরে। সকলেরই প্রশ্ন, আকবরের সিংহাসনে ওটা কোন মর্কট। নিজেকে ধার্মিক বলে। নিষ্ঠাবান ইসলাম বলে দাবি করে। আসলে তো ধূর্ত ভণ্ড। সম্রাট আকবর সূর্যের উপাসক ছিলেন। ফৈজী তাঁর এক 'কাসিদায়' সেই উপাসনার রহস্য উন্মোচন করে গেছেন,

কিসমৎ নিগার কি দর্ খুর্-ই-হর্
জৌহর-স অতস্ত্
আয়িনা বা সিকান্দার উ বা-আকবর
আফতাব্
উ-মে-কুনদ্ মু আইনা-ই-খুদ দর্
আয়িনা।
ভি ইন মে-কুনদ্ মুসাহাদ্-ই
হক্ দর আফতাব্।

ঈশ্বর কাকে কি দেন একবার লক্ষ্য করো। যার যেমন প্রকৃতি সেটি বুঝে, সেই রকমই দিয়ে থাকেন। আলেকজান্দারকে দিয়েছেন আয়না, আর আকবরকে দিয়েছেন সূর্য। আলেকজান্দার আয়নায় নিজেকেই দেখেন, আর আকবর সূর্যের মধ্যে সত্য দর্শন করেন।

দিওয়ান-ই-খাস-এ গোপন বৈঠক। আমির, ওমরাহ। পোশাকের খসখস শব্দ। এসেছেন দারার পরম শত্রু দানিশমন্দ খাঁ। রোশনারা বেগম। এসেছেন বিশ্বাসঘাতক খলিলুল্লা খাঁ, শায়েস্তা খাঁ। ছিলেন নগণ্য হাকিম ক্রমে মহামান্য আমির, সেই অপদার্থ, পশুতুল্য তাকারুব খানও এসেছেন মধ্যরাতের এই গোপন সভায়।

রোশনারা কেন? এই সভায় একমাত্র নারী। সাজাহানের দুই কন্যা, জাহানারা, রোশনারা। জাহানারা সুন্দরী, প্রতিভাময়ী, লেখিকা। জাহানারা দারার ভক্ত, অনুগামী। তবু আরঙ্গজীব এই বোনটিকে ভীষণ ভালবাসেন। জাহানারা প্রকাশ্যেই বলেন, আমি আমার ভাই দারাকে ভীষণ ভালবাসি। তার বাইরেটা যেমন সুন্দর, ভেতরটাও সেই রকম সুন্দর। আমাদের দুজনের দুটি দেহ হলেও, আমরা এক আত্মা, এক প্রাণ। দারা ও জাহানারা দুজনেই সুফী। জাহানারা শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তির জীবনী লিখেছেন, 'মুনিস-উল-আরা।'

আর বোন রোশনারা। সুন্দরী নন; কিন্তু অসম্ভব চতুর। মুখে এক মনে আর এক। বুদ্ধিমতী। আমুদে। রঙ্গ-রসিকতায় পারদর্শী। কামুক। বিশ্রীরকমের যৌনতা। জাহানারা এবং দারা দুজনকেই সহ্য করতে পারেন না। আরঙ্গজীবের সমস্ত রকম চক্রান্ত ও দুষ্কর্মের সাথী।

দানিশমন্দ খাঁ দারার দীর্ঘদিনের শত্রু হলেও, তিনি বললেন, দারাকে হত্যা না করে, কড়া পাহারায় গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হোক। রোশনারা বললেন, অসম্ভব। শত্রুর শেষ রাখা চলে না। দারার মতো শত্রু। যে কোন দিন গৃহ-বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। বাঁচার অধিকার সে হারিয়েছে। মৃত্যু, মৃত্যু।

খলিলুল্লা খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, তাকারুব খাঁ মহা উৎসাহে রোশনারাকে সমর্থন করলেন। সিপির থাকে থাক। বন্দী থাক। দারাকে খতম।

তাহলে তো বিচারের একটা প্রহসন চাই। আরঙ্গজীবের মারাত্মক কৌশল। হত্যাই করা হবে। সেই হত্যাকে আইনানুগ প্রাণদণ্ডের চেহারা দিতে হবে। আরঙ্গজীবকে দারা একটি চিঠি লিখছেন,

আমার ভাই, আমার রাজা,

আমি রাজত্ব চাই না। আমি প্রার্থনা করি এই সিংহাসন তোমার ও তোমার বংশধরদের কাছে প্রীতিপ্রদ হোক। আমাকে হত্যার যে সিদ্ধান্ত তোমার উচ্চমনে স্থান পেয়েছে তার প্রয়োজন নেই। যদি আমাকে একটি বাসস্থান ও আমার একটি বাঁদীকে দেওয়া হয় তাহলে আমি সেই শান্তিপূর্ণ স্থান থেকে মহানুভব সম্রাটের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।

আরঙ্গজীব চিঠিটা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পড়লেন। ঘৃণীত মানুষের চিঠি ঘৃণার যোগ্য। পেছন দিকে একটা কবিতা লিখলেন,

বেয়াদব তুমি, অনেক বেয়াদবী সহ্য করেছি
রাজদ্রোহীদের মধ্যে তুমি একজন।।

চিঠি ফিরে গেল।

বিচার সভা। উলেমাদের ডাকা হয়েছে। দারা যখন পূর্ণ ক্ষমতায়, এই উলেমারা বড় বেকায়দায় ছিলেন। এইবার সুযোগ এসেছে। মুসলমান তুমি, হিন্দুধর্মে তোমার কিসের এত প্রীতি! তোমার আঙুলে একটা আংটি, সেই আংটিতে হিন্দি অক্ষরে 'প্রভু' শব্দটি খোদাই করা আছে। হিন্দু সাধুসন্তদের সঙ্গে কেন এত মেলামেশা! হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'-র অনুবাদ করলে, অনুবাদ করলে 'উপনিষদ'। এ ছাড়াও হিন্দুদের অনেক ধর্মগ্রন্থ তুমি ফারসি অনুবাদ করিয়েছ। ইসলামে তোমার বিশ্বাস নেই। পয়গম্বরের 'মিরাজ-ই-জিসমানি' তুমি বিশ্বাস করো না। হিন্দুদের 'কেশব রাই' মন্দিরে পাথরের রেলিং বসালে কেন? শরিয়তের অনুশাসন তুমি মান না। অবিশ্বাসী আর কাফেরদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা। তুমি ইসলামের শত্রু। তুমি কী করে 'মাজমা-উল্-মাহরায়েন'-এর মতো একটা বই লিখলে? হিন্দু আর মুসলমান ধর্মকে এক করে ফেললে!

প্রাণদণ্ড। এই পৃথিবীতে দারার বেঁচে থাকা চলবে না।

আরঙ্গজীব দরবার ডাকলেন। মালিক জিওয়নকে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে সবিশেষ সম্মান জানানো হল। হাজার সৈন্যের মনসবদার হলেন তিনি। মিছিল নামল পথে। জিওয়ন বেরিয়েছেন নগর পরিক্রমায়। সেলাম আর কুর্নিসের বদলে শহরের ক্ষিপ্ত মানুষ ছুড়তে লাগল ইট, পাথর, কাদা, ছেঁড়া কাপড়। মিছিলের অনেকে আহত হলেন। ঢালের আড়ালে মাথা বাঁচালেন জিওয়ন। বাড়ির ছাদের ওপর থেকে মহিলারা ছাই ফেলতে লাগলেন। মাটির পাত্রে ভরা মলমূত্র। প্রায় বিদ্রোহ। রাজধানী ক্ষিপ্ত।

কতোয়াল তার সান্ত্রীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়লে মিছিলের একটি লোকও বাঁচত কি না সন্দেহ। হতাহত হল অনেকে।

আরঙ্গজীব সেই রাতেই আদেশ দিলেন, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। নিয়ে এস দারার ছিন্ন মুণ্ড। ডাক পড়ল ঘাতক নজর কুলির। এই লোকটি সাজাহানের আশ্রিত ছিল। প্রতিপালিত। ডাক হল সফি খানকে। তিনি তত্ত্বাবধায়ক। আজ রাতে রক্ত ঝরবে খাওয়াসপুরা ভবনে। রাতের তারারা হবে নীরব সাক্ষী। আগস্ট মাস। ভীষণ গরম।

সন্ধে থেকেই দারার সূক্ষ্ম মন বলছিল, আজ একটা কিছু হবে। প্রকৃতি বড় নিস্তব্ধ, রাত বড় গম্ভীর। আজকে বিষ মেশানো খাবার আসতে পারে সিপির। এস কন্দমূল সেদ্ধ করে খেয়ে রাতটা কাটাই।

আগুন জ্বলছে, পাত্রে সেদ্ধ হচ্ছে কন্দমূল। যাঁর সম্রাট হওয়ার কথা! ঘরে অনেক মানুষের ছায়া। এরা কারা? যমদূত! এই তো সেই জল্লাদটা নজরবেগ।

ওই তো সফি খান!

'তোমরা কি আমাদের বধ করতে এসেছ?'

'প্রথমে আমাদের হুকুম অনুসারে যা করার তা হল তোমার ছেলেকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব।'

সিপির তার বাবার পাশটিতে বাবু হয়ে বসেছিল। সামনে উনুন। কন্দমূল সেদ্ধ হচ্ছে। অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ। প্রায় হয়ে এসেছে। সিপির দারার পা দুটো জড়িয়ে ধরে, ভয়ে আতঙ্কে সংজ্ঞাহারা।

ক্রীতদাসরা কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'উঠে পড়, তা না হলে আমরা জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যাব।'

দারা শেষ অনুরোধ করলেন, 'তোমরা আমার ভাইকে গিয়ে বলো তাঁর এই নির্দোষ ভাইপোটিকে এখানে রাখতে।'

তারা বললে, 'আমরা কারো খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার বান্দা নই। আমরা আমাদের প্রভুর হুকুম তামিল করতে এসেছি।'

দারা পুত্র সিপিরকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন। হত্যাকারীরা এক হ্যাঁচকা টানে পিতার বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিল। দারা বুঝতে পারলেন সময় শেষ হয়ে এসেছে। তবু একবার শেষ চেষ্টা।

বালিশের ভেতরে একটা ছোরা লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঝটিতে বালিশ ছিঁড়ে সেই ছোরাটা বের করে যে এগিয়ে আসছিল তার বুকে বসিয়ে দিলেন। এত জোরে যে হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। টেনে বের করতে পারলেন না। ছোরার অভাবে ঘুসি চালাতে লাগলেন। সে আর কতক্ষণ!

আততায়ীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দারা শুনতে পাচ্ছেন পাশের ঘরে পুত্র সিপিরের আর্তনাদ। তারপর।

খাঁড়ার এক কোপে মুণ্ডটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়িয়ে পড়ল। এইবার খুনীদের শোনার পালা।

দারার ছিন্ন মুণ্ড বার বার বলে চলেছে 'কালিমা-এ সাহাদৎ'।

তারা স্তম্ভিত। এমনও হয়। মুণ্ডটি নীরব হওয়ার পর সেটিকে নিয়ে যাওয়া হল আরঙ্গজীবের কাছে। সম্রাটের আদেশ, 'পরিষ্কার করে ধুয়ে একটা থালার উপর রাখ।'

নির্দেশ পালিত হল।

আরঙ্গজীব তরোয়ালের ডগা দিয়ে দারার মুদিত চোখ দুটির পাতা তুলে দেখলেন। এখন নিশ্চিত, এটি তার ভ্রাতা দারার ছিন্ন মুণ্ড। সম্রাটের স্বগতোক্তি,

আহ্ বদ্-বখত্! আমি এই বিধর্মীর দিকে এর জীবন্ত অবস্থাতেই তাকাইনি, এখনও তাকাব না।'

রোশনারা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ভয়ঙ্করীর মাথায় একটি মতলব এল। আরঙ্গজীবের পরামর্শটা খুব ভাল লাগল। সুন্দর একটা বাক্স আন। মুণ্ডটা ভাল করে প্যাক কর। সুদৃশ্য কাগজে বাক্সটা মোড়ো। বেশ বাহারি কর। নিয়ে যাও আগ্রায়। বন্দী পিতা সাজাহানের কাছে। পুত্র আরঙ্গজীবের পাঠানো প্রীতি উপহার।

সাজাহান বড়ই উল্লসিত হলেন। বিদ্রোহী, নিষ্ঠুরপুত্র পিতাকে অবশ্যই কোনো মহার্ঘ উপহার পাঠিয়েছে। 'জাহানারা!'

কন্যা জাহানারা মোড়ক সরিয়ে বাক্সটি খুললেন। বীভৎস উপহার। দারার স্থির মৃত চোখের অপলক দৃষ্টি। দারার কাটা মুণ্ড যেন ফিস ফিস করে নিজেরই লেখা একটি রুবাই আবৃত্তি করছে।,

আত্মা যদি ছুড়ে ফেলে দেহটাকে আবর্জনা স্তূপে/খেদ নেই তাতে/
চামড়া শুকিয়ে গেলে সাপ ছেড়ে দেয় তার জীর্ণ খোলস।

সাজাহান আর কন্যা জাহানারা দুজনেই কাঁপতে কাঁপতে সংজ্ঞা হারালেন।

৩১ আগস্ট, ১৬৫৯। রাজপথে প্রকাশিত হল আর একটি বীভৎস মিছিল। হাতির পিঠে দারার কবন্ধ। প্রতিটি রাস্তা, বাজার ও গলিতে মিছিল ঘুরবে। দিল্লীবাসী দেখবে তাদের প্রাণের দারা আর নেই। আগের দিনের বিদ্রোহের নায়ক, রক্ষী আহাদী হায়বৎকে ধরে আনা হল। আলমগির আরঙ্গজীবের হুকুম। খাঁড়া দিয়ে তার দেহটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফেঁড়ে দুভাগ করা হল। বিদ্রোহী রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল। দুখণ্ড হয়ে দুপাশে পড়ে গেল, যেন বাঁশ চেরাই হল।

দারা বলে গিয়েছিলেন, ভাই আমার সম্রাট আমার, বংশ পরম্পরা ধরে সুখে রাজত্ব করো। আরঙ্গজীব নিজেও সুখী হতে পারেননি, প্রজাদেরও সুখী করতে পারেননি। সিংহাসনে ছিলেন অনেকদিন। ইতিহাসের বিচারে, আরঙ্গজীব একজন ভণ্ড, হিপোক্রিট।

দারা একদিন মহা ক্ষোভে লিখেছিলেন,

মুল্লা যেথা নেই সেথা তো স্বর্গ।
তাদের আলোচনার শব্দ আর তর্কবিতর্ক
পৌঁছে না সেই স্বর্গভূমে।
মুক্ত হোক এ ধরা মুল্লাদের গর্জন থেকে,
তাদের ফতোয়াতে আর কেউ দেবে না কান।

আরঙ্গজীব ফতোয়া জারি করলেন, হিন্দুস্তানে বাস করতে হলে হিন্দুদের

হয় মুসলমান হতে হবে নয় তো মৃত্যু। ইসলাম আর মৃত্যু — বেছে নাও। আরঙ্গজীবের কোষ্ঠী বিচার করে জ্যোতিষীরা পিতা সাজাহানকে বলেছিলেন, এই ছেলেটি স্বয়ংসম্রাটের এবং মোগল সাম্রাজ্যের সর্বনাশের কারণ হবে।

'আমার তরোয়াল ইসলামের অগ্নি ঝলসিত তরোয়াল।' আমি 'শারিয়া' মেনে চলব। ইসলামের আইনই আমার আইন। দশ বছর হয়ে গেল সিংহাসনে আরোহণ করেছি ইসলামের আরও আরও প্রসারের জন্যে তো কিছুই তেমন করা হয়নি! পাঁচশো বছর ধরে ভারতে মুসলিম শাসন চলেছে তবু হিন্দুদের প্রতিপত্তি কী ভাবে বেড়েই চলেছে? এ তো ইসলামের অবমাননা। এ হতে পারে না, এ চলতে পারে না। একটা দেশ জয় করার পর সেই দেশের বিধর্মী প্রজাদের কোনও স্বাধীনতা, মান-সম্মান ধর্ম থাকা উচিত নয়। তারা সবাই দাস। ঈশ্বর এক। বহু দেবতার পূজারীরা হল 'দার-উল-হার্ব'। তাদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ'। যত দিন না তারা দার-উল-ইসলাম' হচ্ছে ততদিন নিপীড়ন চালাও। সমস্ত অধিকার হরণ করে নাও। বাঁচতে হলে আমাদের দয়ায় বাঁচতে হবে। ওরা হল 'জিম্মি'। আরঙ্গজীব কর বসিয়ে দিলেন।

জমিজায়গার ওপর বসল আর একটি কর, 'খরজ'। সাজপোশাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। যারা মুসলমান নয়, 'জিম্মি' তারা সুন্দর, সূক্ষ্ম পোশাক পরতে পারবে না। ঘোড়ায় চড়তে পারবে না। অস্ত্র বহন করতে পারবে না। নতুন কোনো মন্দির তৈরি করা চলবে না। হিন্দুরা প্রকাশ্যে কোনো ধর্মোৎসব, মেলা বা জমায়েতের আয়োজন করতে পারবে না। মন্দির ভেঙে দাও। মূর্তি সব ছুড়ে ফেলে দাও। সর্বত্র ত্রাস, সন্ত্রাস।

হিন্দুদের পূজাপার্বণ, ধর্মচর্চা, শাস্ত্রালোচনা বন্ধ। এক ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম পরশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় কাজকর্ম ছেড়ে দিলেন। যজন, যাজন, অধ্যাপনার আর প্রয়োজন নেই। এক ধর্মোন্মাদ ভারতের সিংহাসনে। আলমগীর আরঙ্গজীব। সমস্ত প্রদেশের শাসকদের কাছে ফরমান পাঠিয়েছেন সম্রাট, বিধর্মীদের সমস্ত বিদ্যালয় আর মন্দির ভেঙে দাও। লেখাপড়া, পূজাপাঠ বন্ধ।

সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করা হল। ভাঙা পড়ল বিশ্বনাথের মন্দির। মথুরার কেশব রাই মন্দির চুরমার হল। উজ্জয়িনী, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে একটি মন্দিরও আস্ত রইল না। গাড়ি গাড়ি দেব-দেবীর মূর্তি চালান গেল দিল্লিতে। জামা মসজিদের সিঁড়ির প্রথম ধাপের তলায় এবং চলার পথের চৌকো, চৌকো কেয়ারিতে বিছিয়ে দেওয়া হল সেই সব মূর্তিখণ্ড। মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাও। পদদলিত কর। সমস্ত মন্দির নষ্ট করে দাও, অপবিত্র করে দাও।

পরশুরাম আসছেন অতীত থেকে ভবিষ্যতের জনক হয়ে। কালের সিঁড়ি ভাঙি ধাপে ধাপে। আদি পুরুষ ভট্টনারায়ণ। কান্যকুব্জ থেকে বাঙলায় এলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমন্ত্রণে। পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। ১১১৯ সাল। সে আজকে! ভট্টনারায়ণের বংশ কালের ধারায় নামছে। আদিবরাহ, বৈনতেয়, সুবুদ্ধি, বিবধেয় গুঁই, গঙ্গাধর, পশুপতি। এই বাইশতম পুরুষ পরশুরাম। পরশুরাম দেশের পরিস্থিতি অনুধাবন করে বুদ্ধিমানের মতো নবাব সরকারে চাকরি নিলেন। তখন কে নবাব? হয়ত হোসেন শাহ। বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর কাল শুরু হবে। বিধৌত হবে, পবিত্র হবে দেশ। যুগের হাওয়া চিরতরে পালটে যাবে।

এই পরশুরাম রাজকার্যে কৃতিত্বের জন্যে 'রায়' উপাধি পেলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়রা হলেন রায়। পরশুরাম রায়। আরো এক পুরুষ পেরলেই কৃষ্ণচন্দ্র। এই কৃষ্ণচন্দ্রকে আমরা অনুসরণ করি। বন্দ্যোপাধ্যায়রা ছিলেন কুলীন-সুরাইমেলের কুল। কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের সাঁকাসা গ্রামে বাস করতেন। মুঘল সম্রাট আরঙ্গজীবের আমল। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সুবেদার বা নবাবের অধীনে রাজস্ব বিভাগে চাকরি করতেন। তাঁর কাজে খুশি হয়ে নবাব তাঁকে 'রায় রায়ান' খেতাব দিলেন। নবাবের চাকরি করলেও কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও বৈষ্ণব।

রাজস্ব আদায়ের কাজে কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রায়ই হুগলিজেলার কৃষ্ণনগরে আসতে হত। কৃষ্ণনগর তখন বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খানাকুল কৃষ্ণনগর অতীত বাংলার এক বিখ্যাত স্থান। চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এই একশো বছরের মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই অপূর্ব স্থানটি গড়ে উঠেছিল। নবদ্বীপের আগেই একটি নবদ্বীপ। যাদবেন্দ্র চৌধুরী, তস্য পৌত্র বংশীধর ও পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে একটি সারস্বত সমাজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনশো গ্রাম জুড়ে এক বিরাট সমাজ। ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মের মহা মহা পণ্ডিতদের সাদরে এখানে আনা হয়েছিল বসবাসের জন্যে। শাস্ত্রচর্চার এক পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই খানাকুল-কৃষ্ণনগর।

খানাকুলের অভিরাম গোস্বামী। ইতিহাসের গুরু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁকে দ্বাদশ গোপালের প্রথম গোপাল বলা হয়েছে,

অভিরাম মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাকোর কষ্টে তুলি যে করিল বাঁশী।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিরামের জন্যে খানাকুলে এসে তীর্থ রচনা করে গেছেন। অভিরাম ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা বহু মন্দির ও শ্রীপাঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই খানাকুলেই ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। তিনি দেখিয়েছিলেন, পৃথিবী যে গোল এটি ইংরেজদের আবিষ্কারের বহু আগে হিন্দু ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, তখন ইংরেজই বা কোথায় আর তাদের বিজ্ঞানই বা কোথায়!

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ 'গোলাধ্যায়' পুঁথি থেকে উদ্ধার করেছিলেন এই শ্লোক— 'করতল-কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম' অর্থাৎ 'যাঁরা হাতের মধ্যে ধরা আমলকী ফলের মতো পৃথিবীকে গোলাকার বলেই জানেন।' পৃথিবীর আহ্নিকগতির আবিষ্কর্তা আর্যভট্টই প্রথম, যিনি বলেছিলেন, সূর্য নয় পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে।

যাদবেন্দু সিংহ রায়চৌধুরী আর একটি নাম। গিয়াসুদ্দিনের আমলে তিনি ছিলেন এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভূস্বামী। তাঁর বৃহৎ পতাকায় শোভিত ছিল লাল টকটকে সূর্য আর যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁর কোনও ভয়ডর ছিল না। যেমন রাগী সেই রকম উদ্ধত। তিনি নবাবের একজন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। বিত্ত-বৈভব ও পরাক্রমের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক, ঈশ্বরপরায়ণ, সাত্ত্বিক। কোনো বিলাসিতা ছিল না। খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন।

যাদবেন্দুর আদিবাস ছিল জাহানাবাদের কাছে গড়মান্দারণে। সেখান থেকে চলে আসেন ধামলায়। ধামলায় ঈশ্বরী সারদাদেবীর প্রস্তরময় মূর্তি স্থাপন করেন। সেই থেকে গ্রামটির নাম হল সারদা। নদীটির নাম ছিল সুন্দর 'রত্নাকর'। ক্রমশ মজে এল। তৈরি হল একটি চর। নদী জলের বদলে উপহার দিল বিস্তীর্ণ এক ভূভাগ। যাদবেন্দু ধামলা থেকে চলে এলেন খানাকুল কৃষ্ণনগরে। অধিকার করলেন ওই মজানদীর বিস্তীর্ণ এলাকাটি। এক নতুন দেশ। তখন তিনি মধ্যবয়সী। জীবনের একমাত্র আনন্দ দেবপূজা আর দরিদ্রনারায়ণ সেবা।

যাদবেন্দু একদিন স্বপ্নে দেখছেন, তাঁর ইষ্ট এসে তাঁকে বলছেন, যাদবেন্দু তুই আমাকে রাধাবল্লভ রূপে এই সুন্দর দেশে প্রতিষ্ঠা কর। পাথর আনবি কোথা থেকে? নবাবের তোরণ-স্তম্ভ থেকে।

ঘুম ভেঙে গেল। সকাল। শুরু হল উদ্যোগ। মন্দির তৈরি হয়েছে। তোরণ-স্তম্ভ থেকে কায়দা করে পাথর খুলে এনে মূর্তি নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে পুরোদমে। ইতিমধ্যে যাদবেন্দুর শত্রুপক্ষ নবাবের কাছে খবর পাঠিয়ে দিল, যাদবেন্দু নবাবের তোরণস্তম্ভ থেকে বহুমূল্য পাথর সরিয়ে নিয়ে দেবমূর্তি তৈরি

করাচ্ছে। যে যে জায়গা থেকে পাথর খুলেছে সেখানে অন্য পাথর বসিয়ে দিয়েছে কায়দা করে।

নবাবের হুকুম হল, হাতী দিয়ে আপরাধীর মুণ্ড ছিঁড়ে আন।

শ্রীমন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে যাদবেন্দু দাঁড়িয়েছিলেন। দেখছেন স্বপ্নের মন্দির কি সুন্দর রূপ পাচ্ছে! নয়চূড়া বিশিষ্ট নবরত্ন মন্দির হবে। শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধাবল্লভকে প্রতিষ্ঠা করবেন।

সৈন্যসামন্তসহ এল মদমত্ত হাতি। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে যাদবেন্দুর মুণ্ডটি দেহ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। সবাই অবাক হয়ে শুনল কাটা মুণ্ড বলছে, 'বড় সাধ রইল মনে, রাধাকান্ত রাধাবল্লভকে বসাতে পারলুমনি নবরতনে।'

নবাবের কাছে এই অলৌকিক সংবাদ নিয়ে গেলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। নবাব অবাক হলেন। অনুশোচনা এল। সামান্য কয়েকখণ্ড পাথরের জন্যে এমন একজন মানুষকে মেরে ফেললেন! যাদবেন্দুর পুত্র কৃষ্ণরামকে ডেকে পিতার পদে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। কৃষ্ণরাম পিতার আদিষ্ট মন্দির কোনওরকমে নির্মাণ করে রাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন।

যাদবেন্দুর পৌত্র বংশীধর। কৃষ্ণনগর গ্রামটির প্রকৃত রচয়িতা এই বংশীধর। বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ কুলীনদের আনালেন। পাড়া তৈরি করলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া, ভট্টচার্য পাড়া, চক্রবর্তী পাড়া। নিজেরা যে এলাকায় বাস করতেন, সেই এলাকার নাম হল বাঁড়ুয্যেপাড়া।

এই পাড়াগুলিকে ঘিরে বসালেন বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষদের। যেমন, তন্তুবায়, কর্মকার, চর্মকার ইত্যাদি।

এঁদের বংশের সকলেই ছিলেন উদার। মুক্তহস্তে দানধ্যান করতেন। যাদবেন্দুর প্রপৌত্র শিবচরণ নয়শো বিঘা জমি ও নয়টি পুষ্করিণী দান করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নবাবের রাজস্ববিভাগে চাকরি করেন।

বাংলার নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পাঠালেন। চৌধুরী মশাইদের বিশাল জমিদারি। তাঁরা সুযোগ পেলেই নবাবকে অস্বীকার করে কর-প্রদান বন্ধ করে দেন। যাদবেন্দুর সময় থেকেই তাঁদের প্রবল প্রতাপ। জমির বিলিব্যবস্থা ও খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগরে আসা-যাওয়া শুরু হল।

সেকালের মহা মহা সাধকদের বাসস্থান, পুণ্যভূমি কৃষ্ণনগর।

খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ।।
রাধানগরে বাস যদু হালদার।
হিরামাধব দাস স্থিতি অনন্তসাগর।।

একদিকে বৈষ্ণব শিরোমণি অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথজীউ ও তাঁর বিরাট মন্দির। আর একদিকে বিখ্যাত ঘণ্টেশ্বর শিব। পাশেই কানা দামোদর। শ্মশান। শ্মশানের দুটি ভাগ। ব্রাহ্মণদের জন্যে ব্রহ্মশ্মশান। অব্রাহ্মণদের জন্যে সাধারণ শ্মশান। এই জায়গাটিকে বলা হয় গুপ্তকাশী। চারপাশে দেব-দেবীদের মহামিলন। শ্মশানকালী, বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী ঠাকুরানী, ধর্মঠাকুর, ক্ষুদিরায় আর গৌর-নিতাই। বিরাট শিবলিঙ্গ, অনাদি স্বয়ম্ভূ। প্রতিষ্ঠাতা কেউ নয়। স্বমহিমায় আবির্ভূত। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ। শাস্ত্রে আছে, ঘণ্টেশ্বর হলেন 'গুপ্তকাশীর পতি'—গুপ্তকাশীরাম-পতিং ভজ ঘণ্টেশ্বরম। বহু সাধকের সাধনপীঠ। স্বামী অনুপনারায়ণ, সুদামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, ঈশানচন্দ্র দেব, বটুক বাবাজী।

সাধক আর সাধনপীঠের দুর্বার আকর্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের রাজস্ব বিভাগের কাজ না থাকলেও কৃষ্ণনগরে প্রায়ই আসতেন সাধুসঙ্গের জন্যে। নবাবী চাকরি, মুর্শিদাবাদের সাঁকাসা, কিছুই আর ভাল লাগল না। খানাকুলে দুটি রাধানগর। রত্নাকর নদীর পূর্বতীরে যে রাধানগর, সেই রাধানগরে কৃষ্ণচন্দ্র সপরিবারে চলে এলেন সব ছেড়েছুড়ে। রত্নাকরের পশ্চিমে কৃষ্ণনগর।

কৃষ্ণচন্দ্রের নতুন জীবন শুরু হল। রাধানগরের বাসস্থানে বিগ্রহ স্থাপন করলেন। সাধুসঙ্গ ও পূজা-পাঠেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র, হরিপ্রসাদ, অমরচন্দ্র ও ব্রজবিনোদ।

আমরা ব্রজবিনোদকে অনুসরণ করব। তাঁর জীবন প্রবাহে ভাসতে ভাসতে আমরা এক মহাজীবনের মূলে গিয়ে উঠব। অন্য আকাশ, অন্য আলো।

ব্রজবিনোদ নবাব আলিবর্দির অধীনে চাকরি করতেন। দরবারে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। কালও তো বসে নেই, চলছে। মানুষ ভেসে যাচ্ছে, না সাঁতার কাটছে।

বাংলাদেশে পাঠানরা ঢুকে পড়ল। নদীয়া দখল করলেন বক্তিয়ার খিলজি। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ছেড়ে গেলেন কোথায়! এই সেন রাজত্বকালই বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কাল। দীর্ঘকাল এঁরা রাজত্ব করেছিলেন। শিক্ষায়, ধর্মে, সংস্কৃতিচর্চায়, সাহিত্যের বিকাশে বাংলাকে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। উদার শাসনে পূর্বের সমস্ত অরাজকতা নির্মূল করেছিলেন। আলোর যুগ, প্রগতির যুগ।

চমৎকার ইতিহাস। কর্নাট থেকে এলেন সামন্ত সেন। সুবর্ণরেখার তীরে স্থাপন করলেন ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। তাম্রশাসনে পাওয়া গেল এই ঘোষণা

> তাঁদের বংশে, প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধারা, শত্রুসেনাসাগরে প্রলয়তপন, সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধবল কীর্তি তরঙ্গে আকাশতলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন। প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। হেমন্তের পুত্র বিজয় সেন বিজয় সেনের তিন পুত্রের অন্যতম বল্লাল সেন।

এই বল্লাল সেন। পিতার মৃত্যুর পর ১১১৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। টানা পঞ্চাশ বছর তাঁর রাজত্বকাল। মিথিলা জয় করলেন। সমসময়েই পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে লাভ। রটে গিয়েছিল যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধ জয় ও পুত্রলাভকে স্মরণীয় করার জন্যে নতুন সম্বৎ প্রবর্তন করলেন। বছরের নতুন হিসেব। পুত্রের নাম অনুসারে নাম রাখলেন লক্ষ্মণ সম্বৎ। ছোট করে লসং।

বল্লাল সেন বিখ্যাত। ততোধিক বিখ্যাত লক্ষ্মণ সেন। বল্লাল সেন লিখলেন 'দানসাগর'। দেশের সমাজ ও ধর্মের ওপর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে গুণানুসারে কৌলীন্যের মর্যাদা স্থাপন করলেন। তাঁর রাজ্যে এই কুলীনরা সর্বত্র বসতি স্থাপন করলেন। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি আবার বাড়ল। তন্ত্র এল ধর্মের পরিসরে। বিবৃত বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হল। বল্লাল সেন নিজে তান্ত্রিক ছিলেন। হিন্দুমতে তন্ত্রসাধনা করতেন। বৌদ্ধদের তান্ত্রিক শাখার ওপর প্রচণ্ড বিদ্বেষ। শুরু হল তাদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার। সুবর্ণবণিক, যোগী আর বৌদ্ধদের দেশছাড়া করতে চাইলেন। মজার মানুষ নৃপতি বল্লাল। অসীম শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য। পরিবার পরিজন কাব্যানুরাগী। সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন। কাব্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর বাদানুবাদ। রঙ্গ-রসিকতা। শস্ত্র আর শাস্ত্র উভয়েই পারদর্শী সমান।

কিন্তু সেই এক সমস্যা, নারীর আকর্ষণ। টলে গেলেই হল।

এক নীচজাতীয় রমণীর রূপমুগ্ধ হয়ে বল্লাল তাঁকে বিবাহ করে ফেললেন। রাজপুরীর শান্তি নড়ে গেল। পাটরানীর দাপটে সবাই অস্থির। যুবক লক্ষ্মণ তাঁর মায়ের দুঃখে বিচলিত হয়ে প্রৌঢ় পিতার এই পদস্খলনের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

আদরের স্ত্রী সেই সুন্দরী রাজাকে রাজি করালেন, ছেলেকে দূর করে দাও। লক্ষ্মণ সেন নির্বাসিত হলেন। তারপর!

বেশ আছেন সেন মশাই। পূজা পাঠ, সাধন, ভজন, শাস্ত্র আলোচনা, গুণিসঙ্গ। বল্লাল সেন একদিন আহারে বসে দেখছেন, সামনের দেয়ালে লেখা রয়েছে সংস্কৃত ভাষায় দুটি লাইন,

পতত্যবিরলং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি।।

কাব্য মাধুর্যে অপূর্ব। বুঝতে পারলেন লেখিকা তাঁর পুত্রবধূ। লক্ষ্মণের স্ত্রী। অন্যায় করেছেন। নারীর মোহে পুত্রকে পাঠিয়েছেন নির্বাসনে।

আহার পরিত্যাগ করে উঠে পড়লেন। পতিবিধুরা পুত্রবধূর মর্মোক্তি তাঁকে স্পর্শ করেছে। বল্লাল অনুতপ্ত। বিশ্রাম ভুলে চলে এলেন রাজদপ্তরে। ডেকে পাঠালেন রাজনাবিকদের।

'শোনো, কাল সূর্যোদয়ের আগে আমার পুত্রকে তোমাদের মধ্যে যে খুঁজে এনে দিতে পারবে তাকে আমি পুরস্কার হিসেবে রাজ্যাংশ দান করব।'

দলে একজন ছিলেন, খুব সাহসী ধীবর। জানের পরোয়া করতেন না। তাঁর নাম ছিল সূর্য। দুঃসাহসী সূর্যমাঝি। সূর্য বললেন, আমি চেষ্টা করে দেখছি। রাজা বল্লভ সেন পুত্রের উদ্দেশে সাংকেতিক একটি শ্লোক লিখে সূর্যের হাতে দিলেন,

সন্তপ্তা দশমধ্বজাগতিনা সন্তাপিতা নির্জনে।
তুর্য্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশেভস্তনী।।
সা যষ্ঠী নৃপপঞ্চমস্য ভবিতা ভ্রুসপ্তমী বর্জিতা।
প্রাপ্নোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্নং তৃতীয়ে ভব।।

সমগ্র শ্লোকটি জ্যোতিষের সংকেতে ভরা। সংকেত ভাঙলে অর্থ হবে —

হে বৃষ (২য়) বৎ বলী (পুত্র), মকর সমাগমে কর্কট মীনবৎ (৪র্থ ও ১২শ), মকরকেতন (কন্দর্প) সমাগমে করিকুম্ভ (১১শ) স্তনী (বধূ) প্রপীড়িতা এবং সেই তুলা (৯ম) বা তুলনারহিত অর্থাৎ অতুলনীয়া ভ্রূসম্পন্না কন্যা (৬ষ্ঠ) সিংহ (৫ম) তুল্য রাজকুমারের পত্নী হইয়াও বৃশ্চিক (৮ম) বৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; হে মেষবৎ (১ম) বিনীত পুত্র, শীঘ্র আসিয়া উভয়ে মিথুন (৩য়) অর্থাৎ মিলিত হও।

পুত্র লক্ষ্মণের স্ত্রীর নাম তান্দ্রাদেবী। তিনি দেয়ালে যে-শ্লোকটি লিখেছিলেন, তার অর্থ —

বর্ষার অবিরল এই বারিধারা
আনন্দে নৃত্যশীল শিখিরা
হয় আমার স্বামী আর না হয় যম, দুজনের একজন
আমার দুঃখ দূর করতে পারেন।

'অসংখ্য ক্ষেপণীযুক্ত এক তরণী'। বহু দাঁড়বিশিষ্ট এক নৌকা সূর্য মাঝির পরিচালনায় জলে ভাসল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই লক্ষ্মণ সেন ফিরে এলেন রাজগৃহে। লক্ষ্মণ ছিলেন কোথায়? বোধহয় সুন্দরবনে।

সুন্দরবন এখন বনাঞ্চল। তখন? মুসলমানরা এ-দেশে আসার আগে, গুপ্ত, পাল আর সেন রাজগণের রাজত্বকালে এই অঞ্চলে ছিল বহু সমৃদ্ধ জনপদ। প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন যতই আবিষ্কৃত হচ্ছে ততই প্রমাণিত হচ্ছে, এক সময় কি ছিল! কেমন করে আলো থেকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ইতিহাসের রঙ্গভূমি। কত প্রাচীন! রামায়ণে উল্লেখ আছে। সেখানে এই নিম্নবঙ্গের নাম 'রসাতল'। মহাভারতে আছে, অর্জুন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গঙ্গাসাগরে স্নান করেছিলেন। পদ্মপুরাণে সমৃদ্ধ এক জনপদের উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় রাজা সুষেণের শাসন অধিকারে। অরণ্যও ছিল জনপদও ছিল। সেই অরণ্যে শুধু বাঘ নয়, গণ্ডারও ছিল।

সূর্য মাঝি তাঁর এই সাহসী কাজের পুরস্কার পেলেন, সূর্যদ্বীপ অঞ্চল। যশোরের মহেশপুরে সূর্যনারায়ণের প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন এখনো আছে। মহেশপুরকে আজও বলা হয় সূর্যমাঝির দেশ। ধীবর রাজ্য।

বল্লালের রাজত্বকালে যুবরাজ লক্ষ্মণ তাঁর সমর অভিযানে সহকারী হতেন। লক্ষ্মণ ছিলেন বীর যোদ্ধা। সেন রাজবংশে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। লক্ষ্মণ পুরী, বারাণসী ও ত্রিবেণীতে 'সমর জয়স্তমভমালা' স্থাপন করেছিলেন। পিতা ও পুত্র উভয়ে মিলে কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। কাশীরাজকে যুদ্ধে পরাভূত করেছিলেন। সবই করেছিলেন। পারেননি মুসলমানদের ঠেকাতে। হিন্দুরাজত্বের শেষ রাজত্ব। লক্ষ্মণ সেনের পরিচয়, পরম পণ্ডিত, নানা শাস্ত্রবিৎ, সুকবি, একান্ত বিদ্যোৎসাহী, দানে কল্পতরু। রাজত্বের শেষভাগে শস্ত্রচর্চার বদলে শাস্ত্রচর্চাই করতেন। তাঁর রাজসভা পণ্ডিতসভায় পরিণত হয়েছিল। সেই 'পঞ্চরত্নসভার' অলংকার ছিলেন, 'গীতগোবিন্দের' জয়দেব, 'পবন-দূত'-এর কবিরাজ ধোয়ী, অসাধারণ কবি শরণ, মহামন্ত্রী উমাপতি ধর। 'আর্য্যাসপ্তশতীর' গোবর্ধন। সেন রাজত্বকালেই দক্ষিণাপথ পেরিয়ে বঙ্গদেশে এল বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। পাণিনির ব্যাকরণও রইল। বৈদিক শাস্ত্রচর্চার পথ সুপ্রশস্ত করার জন্যে লক্ষ্মণ সেনের আদেশে পুরুষোত্তম রচনা করলেন 'ভাষাবৃত্তি'। তাঁর প্রাড়্বিবাক বা প্রধান বিচারপতি হলায়ুধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলনের জন্যে লিখলেন, 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সুকবি। তাঁর শ্লোকের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করলেন শ্রীধরদাস। সঙ্কলনটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

তন্ত্র যে ভক্তিমার্গে প্রবাহিত হবে! ভক্তিতরণীর মহানাবিক গৌরচন্দ্রের আসবার সময় হল, তাই জয়দেব রেখে গেলেন, 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী'। বল্লাল তাঁর রাজত্বকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেকটি খণ্ডের একটি

করে রাজধানী। বঙ্গের রাজধানী ছিল, বিক্রমপুরের রামপালে। বরেন্দ্রের রাজধানী, পৌণ্ড্রবর্ধনে। সেই রাজধানীর সাক্ষী অতীতের বিশাল দীঘি, দুর্গপরিখা, ইটের ঢিবি। মালদা শহরের কাছে একটি এলাকার নাম 'বল্লাল বাড়ি'। লক্ষ্মণ সেন রাজা হয়ে পৌণ্ড্রবর্ধনের অদূরে গঙ্গার ভাগীরথী শাখার তীরে সুরম্য লক্ষ্মণাবতী নগর নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমানরা বলত লক্ষ্ণৌতি বা গৌড়। রাঢ়ের রাজধানী ছিল বীরভূমের লক্ষ্ণৌয়ে। বঙ্গবিজয়ের পর পাঠানরা এই জায়গাতেই ঘাঁটি গেড়েছিল। মিথিলার রাজধানী কোথায় ছিল সঠিক জানা গেল না। অনুমান, পূর্ণিমা জেলার 'রামাবতী' নগরী। 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে একটি উল্লেখ পাওয়া গেল, 'পুরী রামাবতী যত্র ভুব বিখ্যাতনামিকা'।

শেষ কেন নবদ্বীপে?

এর উত্তর মহাকালের দপ্তরে।

মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান
জহ্নুনগরোত্তরে করে যে বাসস্থান।

নবদ্বীপে গড়ে উঠল বল্লাল নগর। বিশাল সেই দীঘি। আজও পড়ে আছে স্মৃতি আকাশের ছায়ায়। বল্লাল দীঘি। প্রকাণ্ড একটি ভগ্ন অট্টালিকা। একদার রাজপ্রাসাদ। তখন তিন দিকেই ছিল ভাগীরথী। সুন্দর একটি দ্বীপ। পবিত্র তীর্থস্থান। বৃদ্ধ নৃপতির সঙ্গে এলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। গড়ে উঠল প্রসিদ্ধ একটি শিক্ষাকেন্দ্র। না কোনো দুর্গ, সৈন্যাবাস। মহাপ্রভু এসে দেখবেন। তাই কি এমন আয়োজন!

বল্লাল বিদায় নিলেন। পুত্র লক্ষ্মণ সগৌরবে রাজ্য শাসন করতে করতে বৃদ্ধ হলেন। সময় পড়ার দক্ষতা ছিল। ভারতের বিভিন্ন রণভূমে একের পর এক পরাজয়ের বার্তা। রাজপুতদের মতো বীর যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের হাতে নিহত হচ্ছেন। জয়পাল প্রমুখ প্রবল প্রতাপান্বিতরা প্রাণ দিলেন। সোমনাথ মন্দির পাণ্ডা ও পুরোহিতদের রক্তে ভেসে গেল। পাঠানরা আসছে।

লক্ষ্মণ সেনের বয়েস প্রায় আশি। যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেক হয়েছে আর নয়! বিদ্যা, বুদ্ধি, জাত্যভিমান, আর প্রবীণ বয়েস, এই সব একত্রিত হয়ে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ও সম্মান। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ভারতীয় ধর্ম জগতের আচার্য। মুসলমানরা বলেন, 'খলিফা'।

লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে জ্যোতিষীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। সেই জ্যোতিষী বললেন, এইবার সাবধান হওয়ার সময় এসেছে।

কেন? পাঠানরা স্থলযুদ্ধে পারদর্শী। এই নদী-নালার দেশে আসবে কি?

ভরসা কোথায়? অত সৈন্য আর সমরোপকরণ যাঁর, সেই কাশীরাজ নিহত, পরাজিত। মগধের গোবিন্দপালের রাজত্ব ছারখার। বিক্রমশীলা, উদ্দণ্ডপুর, বিহার ধ্বংস। শত্রু প্রায় দরজায়।

জ্যোতিষী জানালেন, উদ্ভট আকৃতির একটি লোক বঙ্গবিজয় করবে। তার হাত দুটো এতটাই লম্বা হবে, যে জানু-টানু নয় একেবারে গোড়ালি স্পর্শ করবে।

কে তিনি?

বক্তিয়ার খিলজি।

লক্ষ্মণ সেন তাঁর পুত্র, পরিবার, রাজ্যের নামকরা ধনী ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে অস্থাবর সম্পত্তিসহ পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। মুসলমান সৈন্য নদ-নদী রক্ষিত এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হবে। তাদের বাহন ঘোড়া। নৌকো নয়। সকলকে নিরাপদ স্থানে পাঠালেন; কিন্তু নিজের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই করলেন না। একদল গেলেন জগন্নাথে। শ্রীক্ষেত্র এই ডামাডোলের ভারতে অনেকটাই নিরাপদ। আর একদল গেলেন উত্তর-পূর্ব উপকূলে।

আপনি নিজের নিরাপত্তার কথা কিছু ভাবলেন কি!

নৃপতি লক্ষ্মণ সামান্য হেসে বললেন, 'বখতিয়ার তো বোকা নয়। সে অত ঘটা করে একটা রাজ্য আক্রমণ করবে কেন? একটা কারণ থাকবে তো! প্রথম কারণ লুঠপাঠ। সোনা-দানা-টাকা-কড়ি। তার জন্যে তো লক্ষ্মণাবতী পড়েই আছে। গঙ্গার তীরে এই নবদ্বীপ তীর্থে আছেটা কি? দরিদ্রদের দেশ। কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, আর আছেন কিছু পণ্ডিত।

গঙ্গার তীরে নিরালা শান্ত পরিবেশে বেশ আছেন লক্ষ্মণ। জীবনের আশিটা বছর পার করেছেন। পরচর্চার আর সময় নেই, এখন আত্মচর্চা। একটা খবর এল, অদ্ভুত চেহারার এক বিদেশী এসেছে। সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী আছে। সবাই মুসলমান। নিরীহ, ভদ্র। বলছে ঘোড়ার ব্যবসা করে।

সে করে করুক, তবে ভুল জায়গায় এসেছে। এখানে ঘোড়া কোথায়? গোটাকতক গাধা থাকলেও থাকতে পারে।

রাজা লক্ষ্মণ সেন নিশ্চিন্তে গঙ্গা-স্নান করলেন। পূজা-পাঠ শেষ করে আহারে বসেছেন। এমন সময় ভোজনকক্ষের দরজায় করাঘাত।

সেই মুসলমান। হাতে অস্ত্রশস্ত্র।

কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখ।

রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়নের গুপ্ত পথ ছিল। গুপ্তদ্বার। সুড়ঙ্গ। একটি খাল। খালপথে গঙ্গা। লক্ষ্মণ সেন তাঁর মহারাজ্ঞীকে নিয়ে বখতিয়ারের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেন। পড়ে রইল অন্তঃপুরচারিণী দাসীরা। বখতিয়ার তাদের বন্দী

করে নিয়ে গেলেন।

বখতিয়ারের সঙ্গে ছিল দশ হাজার সৈন্যের একটি দল। নবদ্বীপের বাইরে একটি জঙ্গলে তাদের লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন লক্ষ্মণ সেনকে বন্দী করে তাঁর পুত্রদের নিয়ে বঙ্গবিজয়ের একটি খৎ লিখিয়ে নেবেন। আরও ভেবেছিলেন, খ্যাতিমান প্রবীণ রাজাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দিল্লীশ্বরকে উপহার দেবেন। তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে, বাহা-বাহা করবেন।

লক্ষ্মণ সেন চলে গেলেন যশোর-খুলনার সেনহাটিতে।

বঙ্গে বাঙালির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। শুরু হল পাঠান রাজত্ব! পাঠান যুগে যাঁরা রাজত্ব করলেন তাঁরা সবাই আফগান ছিলেন না। কেউ আরব, কেউ খোজা, কেউ হাবসী, কেউ হিন্দু। এই সময় বঙ্গে যে অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটল, তা আর এক ইতিহাস—হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি! সব একাকার হয়ে গেল। হিন্দুর ঘরে মুসলমান জামাই, মুসলমানের ঘরে হিন্দু। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুত রক্ত মিলিয়ে দুই জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব রচনা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের যে অবাধ মেলামেশা ঘটেছিল ভারতের আর কোনো দেশে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। জাতীয়জীবনে একটা নতুন দিক খুলে গেল। কুলীন ব্রাহ্মণদের দাপট, আর শাস্ত্রের ফাঁস আলগা হয়ে যাওয়ায় সর্বস্তরের মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বাংলার গ্রাম জীবন আর সংস্কৃতি নিয়ে জেগে উঠল। পাশ দিয়ে তুর্কি ঘোড়া ছুটে যায়। একটু ধুলো উড়ে আসে, রক্তারক্তি তরোয়ালবাজি আসে না। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন স্বীয় গুরু জিন্দাগাজীর নিকট বর প্রার্থনাপূর্বক গান ধরেন, 'মক্কা মদিনা বুন্দলাম কাশী গয়াথান' সেই বাঙলার চিত্রটি ছিল এই রকম অপূর্ব —

'রাজরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুদ্ধ বিগ্রহাদি-উত্থানপতন প্রভৃতি রাজকীয় পতাকার নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থান্তর পল্লীসমাজকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ তাঁহার খড়ো ঘরের মেজেয় মাদুর পাতিয়া খাপের কলম দিয়া তেরেট বা তালপত্রের উপর বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইতেন; বৈয়াকরণ, তার্কিক ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তাঁহারা মুক্তকচ্ছ হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বিলাস তাঁহাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের খড়ো ঘরের চালার উপর অলাবুলতা দুলিয়া তাঁহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও সাংসারিক নিস্পৃহতা প্রমাণ করিত। কোন কোন সময় এক একটা রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেশীদিন থাকিত না। দেশের বাণিজ্যাদির উপরও বাদসাহেরা কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এ দেশে প্রবেশ

করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাঁহারা একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা বাদসাহের বা তৎপ্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজনের জন্য শরীরে বর্মচর্ম আটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই উদ্যত হইয়া থাকিতেন ; ইঁহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষিপ্রধান বাঙলার একরূপ মালিক ছিলেন। শুধু কৃষি নহে, ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে ছিল। স্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, 'অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন ; গৃহসুখ তাঁহাদের কপালে বড় থাকিত না। কারণ প্রায়ই তাঁহাদের নেতাদের আহ্বানে তাঁহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত। বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কার্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।' এই সকল কারণে বঙ্গদেশে কোন স্বর্ণখনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশ 'সোণার বাঙ্গলা' উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল।'

হিজিবিজি রাজত্ব শেষ হওয়ার পর, গোলমালে সিংহাসন অধিকার করলেন হোসেন শাহ। সে বড় মজার ইতিহাস। হোসেন শাহ বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গোরক্ষক ছিলেন। ভাগ্যগুণে রাজা হলেন। তাঁর ব্রাহ্মণ প্রভুকে চাঁদপাড়ায় এক আনা পরিমাণ রাজত্ব দান করলেন। সেই থেকে চাঁদপাড়ার নাম হল, 'এক আনা চাঁদপাড়া'।

না, এই সব নয় অন্য কাহিনীও আছে। সে থাক।

হোসেন শাহ সিংহাসন লাভ করে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে গৌড় লুণ্ঠন করতে বারণ করেছিলেন। সে আদেশ যখন পালিত হল না তখন তাঁর আদেশে বারো হাজার সৈন্যের প্রাণদণ্ড হল। হোসেন শাহের আর এক আদেশে যে পদাতিক সেনাদল প্রাসাদ রক্ষার কাজে ছিল, তাদের বিদায় করা হল। বিশ্বাসঘাতক হাবশী ক্রীতদাসদের গৌড়রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হল। সৈয়দ-বংশীয়, মোগল ও আফগানজাতীয় মুসলমানরা প্রধান, প্রধান রাজপদে নিযুক্ত হলেন। বসুবংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পুরন্দর খাঁ হলেন উজীর। দুই ভাই, রূপ আর সনাতন। সনাতনকে করলেন 'দবীর খাস্', প্রাইভেট সেক্রেটারি। রূপ পেলেন 'সাকর মল্লিক' উপাধি। হোসেনের শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। আবার এও আছে, সনাতন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, 'সাকর মল্লিক' আর রূপ ছিলেন 'দবির খাস'।

দাক্ষিণাত্যের এক রাজকুলে জন্মেছিলেন তিন ভাই রূপ, সনাতন আর অনুপম। অবস্থা বিপাকে পড়ে এঁরা তিন জনে পিতৃবন্ধু বাংলার পাঠান রাজার সরকারে চাকরি নিয়েছিলেন। সনাতন পরম পণ্ডিত। সংস্কৃত, ফারসী আর

আরীতে তাঁর মতো পণ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল।

অনুপমের নাম ছোট হয়ে অনুপ হল। অনুপ গৌড়ের টাঁকশালের অধ্যক্ষ হলেন। এঁরা গৌড়ের কাছে রামকেলী গ্রামে বাস করতেন। রামকেলীতে দুটি দীঘি আছে একটির নাম 'রূপসাগর', আর একটির নাম 'সনাতন সাগর'।

হোসেন শাহ ভীষণ খামখেয়ালি ছিলেন। কখনো দয়ারসাগর, কখনো চরম নিষ্ঠুর। সনাতনের বড় শ্যালকও রাজপদে ছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ন করতেন। এর জন্য হোসেন আক্ষেপ করতেন। আবার উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানে গিয়ে হোসেন হিন্দুদের উপর এমন অত্যাচার করলেন রূপ আর সনাতন তাঁর ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারালেন।

এলেন তিনি। এলেন রামকেলীতে। যাবেন বৃন্দাবন। সকলের মুখেই এক কথা। দেবতা এসেছেন। মানুষের এমন রূপ হয় না। এমন ভাব! এত প্রেম!

চমপকসোণ-কুসুম কনকাচল
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব

লক্ষ লোক সমবেত। আরো, আরো ছুটে আসছে পাগলের মতো। কে এই সন্ন্যাসী! কেমনতর তাঁর আকর্ষণ! 'সাকরমল্লিক' সনাতন, যাঁর হিন্দুনাম ছিল অমর, একবার দেখতে গেলেন রঙ্গটা কী? 'দবির খাস' রূপ যাঁর হিন্দুনাম ছিল সন্তোষ, তিনিও গেলেন।

১৫১০ সাল। মাসটা জানা গেল না। স্থান গৌড়ের রামকেলী। দুই রাজপুরুষ আর শ্রীচৈতন্য। দুই ভ্রাতার জীবন বদলে গেল। কে করবে ওই পাঠানের চাকরি। মহাপ্রভু বড় পছন্দ করলেন সনাতনকে। সনাতনের মনে হল, তাঁর দেবদর্শন ঘটল।

মহাপ্রভুকে তিনি কিছু সাবধান করলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, যাচ্ছেন তীর্থদর্শনে! অথচ হাজার হাজার মানুষ উৎসব আনন্দে আপনার পেছন পেছন ছুটছে, মনে হচ্ছে, যেন কোন রাজাধিরাজ মহাসমারোহে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন! এ আপনি ঠিক করছেন না। সাবধান করার কারণ, এই হুসেন সাহ মহা খামখেয়ালি। এই সেদিনও উড়িষ্যার কিছু দেবালয় ও বিগ্রহ চুরমার করে এসেছেন। এখনও পর্যন্ত আপনার উপর তাঁর ভাল ভাব ; কিন্তু ভাবান্তর হতে কতক্ষণ। এই বিপুল সমারোহ তিনি সুনজরে নাও দেখতে পারেন। কুলোকের কুপরামর্শে আপনার ওপর অত্যাচার হতে পারে। আপনি ফিরে যান।'

বাইরে লক্ষাধিক ভক্তের কীর্তনে আকাশ-বাতাস ভাসছে। মহানন্দে নাচছে। সনাতনের কথায় মহাপ্রভুর খেয়াল গেল সেই দিকে। নবদ্বীপে কাজীদলন করেছিলেন, তখন ছিলেন বিপ্লবী। এখন যে বিরহী! তখন যে প্রেমের তরঙ্গে

নদীয়া ভাসিয়েছিলেন।

প্রেমের তরঙ্গে নদীয়া মাতিল, চারিদিক মধুরময়

মহাপ্রভুর সময়ের নদীয়া, সেইকালের কলকাতা শহর ও শহরতলির চেয়ে অনেক অনেক বড় ছিল। নদে করে টলমল, টলমল।

'নদে টলমল টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলেরে।'

অতীতের দিকের জানালাটা একবার খোলা থাক। অনেকটা এদিকে চলে এসেছি আমরা। সব গৃহেই স্থাপিত হয়েছে 'আম্রশাখা-সহ পূর্ণকুম্ভ'। কলাগাছ রোপণ করে মহাপ্রভু তাঁর মহাসংকীর্তনের দল নিয়ে কখন কোন পল্লীপথ পরিক্রমা করবেন তা যে জানা নেই। তাই সারা নদীয়ার এই সাজ। সন্ধ্যা যেই নামল আলোকিত হল সব বাড়ি। আনন্দের হিল্লোল। রমণীরা সাজলেন সুন্দর বেশভূষায়। সংগ্রহ করলেন, খৈ, কড়ি, বাতাসা।

'কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে।।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর।।'

সন্ধ্যাসমাগমে সমগ্র-নবদ্বীপ আলোয় আলোকিত। আনন্দের হিল্লোল। এরই মাঝে অশ্বারোহী কোনো তুর্কী সৈন্য। ঘোড়াটি তার পা মেপে মেপে চলেছে। বড়ই বিষণ্ণ। যুদ্ধ কোথায় পালাল! রণক্ষেত্র কেন রোজই, রোজই এমন উৎসবমুখর! দলে দলে মানুষ চলেছে কোথায়? প্রত্যেকের হাতে এক একটি মশাল। প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে একটি করে তৈলভাণ্ড। গলায় দোলে ফুলের মালা। চন্দনচর্চিত অনাবৃত অঙ্গ। পিতার হাতে একটি মশাল, পুত্রের হাতেও একটি। অনেকের দুহাতে দুটি।

দলে দলে মানুষ মশাল হাতে নিমাই পণ্ডিতের গৃহের বাইরে সমবেত হচ্ছেন। হাজারে হাজারে। আকাশে চাঁদ। নীচে হাজার হাজার মশালের শোভা। আলো। আলোয় আলোকময়। এ কোন অলকা?

আজ যেন বিশাল আয়োজন! অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি।

পাঠানের নবদ্বীপ। শাসক, চাঁদকাজী। মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বাড়লেও হিন্দুপ্রধান। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নেই। মুসলমানদের অনেকেই পূর্বে হিন্দু ছিলেন। পূর্বপুরুষদের নাম, হিন্দুদের সঙ্গে তখনকার সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক মনে আছে। অনেকের জ্ঞাতি-কুটুম্ব হিন্দু। কেউ নানা, কেউ চাচা, কেউ মামু। মধুর সম্পর্ক।

তবু নিমাইয়ের এই জনপ্রিয়তা, প্রভাব, প্রতিপত্তি কিছু ঈর্ষাপরায়ণ, দুষ্ট

প্রকৃতির হিন্দুর অসহ্য হল। তাঁরা দল বেঁধে চাঁদ কাজীর কাছে নালিশ জানাতে গেলেন। কয়েকজন মুসলমানকেও দলে ভেড়ালেন। তাঁরা বললেন, 'নিমাই পণ্ডিতের জ্বালায় নবদ্বীপে আর থাকা যায় না। তার কীর্তনের চিৎকারে আমাদের রাতের ঘুম চলে গেছে।' মুসলমানরা বললেন, 'আমরা নামাজ পড়তে পারি না।'

কাজিসাহেব তাঁদের নালিশ খুব একটা কানে তুললেন না। তিনি ভদ্রলোক, মহাশয় লোক। গৌড়ের নবাবের দৌহিত্র। নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর অতি হৃদ্যতা। গ্রাম সম্বন্ধও ছিল। নীলাম্বরকে তিনি 'চাচা' বলেন। কাজি পাত্তা দিলেন না এই ভেবে, 'নিমাই পণ্ডিত ছেলেমানুষ। কি করছে তার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।' কিন্তু তাঁর অধীনস্থ মুসলমান কর্মচারীরা তাঁকে উত্যক্ত করতে লাগলেন। তখন এদিন সদলে কাজী বেরলেন নগরপরিক্রমায়। সন্ধ্যাসমাগমে।

কী দেখছেন? নদীয়ার সর্বত্র মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। কাজী কাকে থামাবেন! কোথায় কোন দলকে চুপ করাবেন! সবাই তো উন্মত্ত। ভাবে আত্মহারা।

কাজীর কর্মচারীরা তখন একটি গৃহে প্রবেশ করে তাদের মৃদঙ্গ আছাড় মেরে চুরমার করল। সৈন্যসামন্ত দেখে কীর্তনকারীরা ভয় পেয়ে গেলেন। চৈতন্যভাগবতকার বর্ণনা দিচ্ছেন,

হরিনাম কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র।
শুনিয়ে স্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র।।
আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন।।
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।

এরপর কাজি এই বলে ভয় দেখালেন, 'আজ এই হল। এর পরেও যদি এই নগরে কেউ সংকীর্তন করে তাহলে তার জাত মারা হবে।' সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাজি ফিরে গেলেন।

আজ সেই কাজির মুখোমুখি হবেন নিমাই পণ্ডিত। আজ এই চাঁদনী রাতে। দলে দলে আসছেন। আরো আসছেন। হাতে জ্বলন্ত মশাল। কোমরে ঝুলছে তৈলভাণ্ড। গলায় দুলছে ফুলের মালা।

মহাপ্রভুর অঙ্গন ভরে গেছে। তাঁরা সবাই অন্তরঙ্গ। বাইরে হাজারে হাজারে তাঁরা, যাঁরা বহিরঙ্গ। আর স্বয়ং নিমাই অন্দরে। সেখানে গদাধর তাঁর বেশবিন্যাস

করছেন। প্রভুর বদন সাজানো হচ্ছে 'অলকা-তিলকায়।' আমরা একটু দেখি, সে সাজ কেমন! সুন্দর কেশদাম কপালের দিকে টেনে নামিয়ে পাতা কেটে বাঁধা হয়েছে। এর পর চন্দনের সাজ। কপালে তিলফুলের মতো ফোঁটার সারি। নাকে অপূর্ব তিলক। দুটি গালে কদমফুলের মতো দুটি চিত্রকিরণ। কপালের মাঝখানে একটি ফাগের বিন্দু। দু চোখে সূক্ষ্ম কাজলের টান। মাথার মাঝখানে চুলের চূড়া। চূড়ায় বেড় দিয়েছে মালতির মালা। তারপর সর্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত করলেন গদাধর। মহাপ্রভু এই উঠে দাঁড়ালেন। পরিধানে পট্টবস্ত্র। সামনে লুটিয়ে আছে কোঁচা। বিশাল একটি মালা গলায় পরানো হয়েছে। একটি পাট করা চাদর শলার দুপাশ দিয়ে নেমে এসেছে প্রশস্ত বক্ষে। দুটি পায়ে নূপুরের রুনুঝুনু। বেশ করে গদাধর ও নরহরি খুঁটিয়ে দেখছেন, কোন কিছুর অভাব আছে কি-না!

না, ঠিক আছ।

আহা! এতরূপ!

শচীমাতা, অন্যান্য প্রবীণারা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও অন্যান্য অল্পবয়স্কারা আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কেউ চোখ ফেরাতে পারছেন না। এ যে দেখি সব সুন্দরীর সুন্দরী। অদ্বিতীয়া।

মাঝে মাঝেই বাইরে থেকে ভেসে আসছে হরিনামের হুঙ্কার।

এই অপূর্ব সাজে সেজে নিমাই চাঁদ নেমে এলেন অঙ্গনে। সমবেত পার্ষদের দল দুদিকে সারিবদ্ধ। মাঝের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন প্রভু নিমাই। ধ্বনি উঠল, প্রভু এসেছেন, প্রভু এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে উদ্‌গত হল হরিধ্বনি। যেন সমুদ্রের গর্জন! প্রভুর রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ। অধরে মধুর হাসি। সেই প্রেমময়কে দেখে সবাই আনন্দে গলে গেলেন। সেই সমাবেশ মুহূর্তে পরিণত হল তরল সমুদ্রে। সেই সমুদ্র আর শান্ত রইল না। উঠল হরিনামের ঢেউ। সেই ধ্বনিতরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ছে অঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে। নিমাই সেই ধ্বনির প্রভাবে ক্রমশই পরিবর্তিত হচ্ছেন। 'তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস। হুঙ্কার করেন প্রভু শচিরনন্দন। শব্দে পরিপূর্ণ হইল সবার শ্রবণ।। হুহুঙ্কার শব্দে সবাই হইলা বিহ্বল। হরি বলি সবে দীপ জ্বালিলা সকল।।'

নিমাইচাঁদ এখন জননেতা। দলনেতা। সমাবেশকে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। প্রথম দলের নেতা শ্রীঅদ্বৈত। দ্বিতীয় দলের নেতা শ্রীহরিদাস, তৃতীয় দলের নেতা শ্রীবাস। আর চতুর্থদলের নেতা তিনি স্বয়ং। এই দলে রইলেন নিতাই ও গদাধর। তাঁর দক্ষিণে নিতাই, আর বামে গদাধর।

এই চারটি দল পরে শতদলে পরিণত হল।

সমস্ত বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। শতশত প্রজ্বলিত মশাল। আকাশে চাঁদ। নবদ্বীপের সেই রাত যেন দিন হয়ে গেল। মশালের আগুনে উত্তাপ বেড়ে গেল।

উত্তাল হরিধ্বনির মাঝে প্রথমে বেরলেন শ্রীঅদ্বৈত তাঁর দল নিয়ে। তারপর শ্রীবাস। তারপর শ্রীহরিদাস। সব শেষে স্বয়ং নিমাই। পথের দুদিকে সমবেত হয়েছেন বহু পল্লীবাসী। পাকা বাড়ির ছাতে, বারান্দায় অনেকে।

এত যে লোকের হল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়।।
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে।।
চতুর্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দিকে হরি বলে।।

নবদ্বীপের মানুষ কীর্তনের কথা শুনছেন। মহাপ্রভুর নৃত্যের কথা শুনেছেন। আজ দেখছেন। শাক্ত, বৈষ্ণব দুধারে সমবেত। সবাই মোহিত। এ কি অপূর্ব শোভাযাত্রা। অজস্র মৃদঙ্গ ও করতাল বোল ছড়াচ্ছে। অজস্র মশাল নৃত্য করছে। ফুলের সৌরভে পথ ভাসছে। এই নিমাই? এ যে সাক্ষাৎ ভগবান! সারা শরীর দিয়ে জ্যোতি বেরচ্ছে। ছন্দে ছন্দে পা পড়ছে। উত্থিত দুই বাহু কমল লতার মত দুলছে। বৃন্দাবন দাস দেখেছিলেন। লিখে রেখে গেছেন,

জ্যোতির্ময় কনক বিগ্রহ দিব সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার।
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতির মালা।।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে।

মেয়েরা পরস্পরে বলাবলি করছেন, 'সোনার গৌরাঙ্গ নাচে দেখ না আসিয়ে।'

এই অপূর্ব সংকীর্তনের দল যখন যে বাড়ির সামনে আসছে পুরনারীরা শাঁখ বাজাচ্ছেন, হরিধ্বনি করছেন, উলু দিচ্ছেন, খই, বাতাসা আর ফুল ছুঁড়ছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। দলে যাঁরা আছেন, তাঁদের বাহ্যজ্ঞান অনেক আগেই চলে গেছে। যাঁরা দেখছেন তাঁরাও মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাড়ি ঘর খোলা রেখে কীর্তনের অনুগামী। সাধুও নাচছেন, তস্করও নাচছে। ঘরদোর অবারিত, উন্মুক্ত, কিন্তু চুরি ভুলে গেছে চোর।

যাচ্ছেন কোথায়? সোনার গৌরাঙ্গ আজ যাচ্ছেন কোথায় সারা নবদ্বীপের

মানুষকে পেছনে নিয়ে? 'সেই যে অসুর চাঁদকাজি, পাঠান সৈন্য পরিবৃত, সেই কাজির দর্পচূর্ণ করতে।' সে কথা কারো মনে আছে কি? ভাবে ভেসে গেছে উদ্দেশ্য।

নিমাই চলেছেন নাচতে নাচতে। প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়ে নিজের স্নানঘাটে কিছুক্ষণ নৃত্য করলেন। তারপর নাচতে নাচতে নগর কোটাল মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। তারপর বারকোণা ঘাট অতিক্রম করে চলে এলেন নগরের শেষ সীমায়, সিমলায়।

এইবার প্রভু বাঁক নিলেন চাঁদকাজির বাড়ির দিকে। উদ্দেশ্য ভোলেননি। মিছিলের গতি-পথ দেখে নিরপেক্ষ দর্শকরা ভাবছেন, এইবার একটা মহারক্তারক্তি কাণ্ড হবেই হবে। ভক্তির অস্ত্র দিয়ে শক্তির অস্ত্রকে জয় করা যায় কি? পাঠান সেনারা যেই তেড়ে আসবে মৃদঙ্গ ফেলে সব পালাবে, তখন নেতা নিমাই একা। আজ শেষ দিন।

এর আগের কদিন কাজি নিজেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াতেন। দেখতেন, তাঁর আদেশ মানা হচ্ছে কি না। এদিন তিনি বাড়িতেই রয়েছেন।

কাজি ভাবতেই পারেননি, নিমাই একদিনের মধ্যে এত বড় একটা দল তৈরি করে ফেলবেন, প্রায় সারা নবদ্বীপের মানুষ সংঘবদ্ধ হরিনামের যাদুতে! চৈতন্যভাগবতকার বলছেন, 'সর্বপ্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন। দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন। ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল। কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল।'

এত সব ঘটছে কাজি জানতেই পারেননি। আয়েস করছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজিপাড়ার পথ ধরামাত্রই মিছিলের সহস্রকণ্ঠ গর্জে উঠল, 'মার কাজি, মার কাজি'। কাজি শুনতে পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলেন। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—এ কি কাণ্ড। শত শত মশাল। চতুর্দিকে আলোকিত। অসংখ্য মানুষ। এগিয়ে আসছে।

প্রহরীদের বললেন, দেখে এস, এত গোলমাল কিসের? বিয়ের শোভাযাত্রা, না ভূতের কীর্তন? নিমাই যদি আবার কীর্তনের দল বের করে থাকে, সব ব্যাটার জাত মারব। শিগ্গির যাও, শিগ্গির।

প্রহরীরা দৌড়ে পথে নামল।

অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য উজ্জ্বল মশাল, অপূর্ব কীর্তন, অপূর্ব নৃত্য, সমগ্র নদীয়া চোখের সামনে নাচছে। আর সেই নিষিদ্ধ কীর্তন। কাজি শুনছেন। এ কি? সেই কীর্তন! ধ্বনি, ধ্বনি-সমুদ্রের গর্জন। সঙ্গে তর্জন। 'মার কাজি।'

কাজি আরও সৈন্য পাঠালেন।

সৈন্যদল এগোবার সাহস পাচ্ছে না। বিশাল জনতা। প্রত্যেকের হাতে মশাল। অনেকের হাতে বড় বড় ভাঙা ডাল। বৃক্ষকাণ্ড। সৈন্য দেখে তাদের ভঙ্গি ক্ষিপ্ত, 'মার কাজি। মার কাজি!'

সামনের দিক থেকে স্রোত আসছে। পেছনে পালাবার পথও বন্ধ। এই কীর্তন, এই কোলাহল শুনে সেদিক থেকেও অসংখ্য মানুষ কীর্তন নিয়ে আসছেন মূল স্রোতে মেশার জন্য।

কাজির বাহিনী ঘেরাও। হাতে যাবতীয় অস্ত্র, তবু অসহায়। এক ফুৎকারে উড়ে যাবে তারা। কাজির কাছে খবর এল, দলে, দলে মানুষ বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে, তাঁর সেনারা সেই জনসমুদ্রে জল-বিন্দুর মতো হারিয়ে গেছে। কাজি পালাবে! কোথায় পালাবেন? বাড়ি পরিখাবেষ্টিত নয়। প্রহরীরা জনসমুদ্রে তলিয়ে গেছে।

সৈন্যরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সংকীর্তন দলে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কাজি প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছেন অন্তঃপুরে। 'যার দাড়ি আছে সে হয়ে অধোমুখ। লাজে মাথা নাহি তোলে, ভরে হালে বুক।'

কাজির প্রাসাদ ঘেরাও হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ। দেহবোধ নেই। জাতিবোধ নেই। একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা, অন্যায়কারীর শাসন। জনসমুদ্রে কাজির বাড়িটি যেন টোপর। ভাসছে।

কে হিন্দু, কে মুসলমান! সেই সমুদ্রে জাত, ধর্ম তলিয়ে গেছে। কাজির সেনারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে সেই স্রোতে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। যা আছে তা হল 'বিশ্বম্ভর-গণ'! এক নিমাই এখন সহস্র। অনন্ত অর্বুদ লোক কেবা কারে চিনে! আপনার দেহ-মাত্র কেহ নাহি জানে।।'

দাস বৃন্দাবন এই ঘটনার সাংবাদিক। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদনে লিখছেন, 'কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙেন দুয়ার। কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার।। আম্র পনসের ডাল ভাঙি কেহ ফেলে। কেহ কদলীর বন ভাঙি হরি বলে।। পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিরা। উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া।।'

হরিনাম বন্ধ হবে নদীয়ায়! খোল ভেঙে বোল বন্ধ করবে? জাত মারবে নামকারীর? কাজির বাড়ির সদরে এসে মহাপ্রভু কীর্তন থামালেন। নিজের ভাব সংযত করলেন। অতি শান্তভাবে সিঁড়ি ভেঙে বাইরের ঘরে প্রবেশ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কাজি কোথায়?

জানলেন, তিনি অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছেন।

দলের কয়েকজন ভব্য মানুষকে ভেতরে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনার জন্যে।

কাজি তাঁদের সঙ্গে এলেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। মাথা নিচু, জোড়া হাত। নিমাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চাঁদকাজি।

নিমাই মহাসমাদরে তাঁকে পাশে বসালেন। হাসতে হাসতে রঙ্গ করে বললেন, 'এ আপনার কী রকম ভদ্রতা? আপনার বাড়িতে আমরা এলুম, আর আপনি ভেতরে লুকিয়ে বসে রইলেন?'

সেই নম্র, স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর শুনে কাজি এইবার মুখ তুলে তাকালেন। নিমাইয়ের প্রসন্ন মুখে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ একটু আগে বাইরে কি লণ্ডভণ্ড কাণ্ডই না হচ্ছিল! নিমাইয়ের মুখখানি করুণায় পূর্ণ।

কাজি তখন বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছিলুম। আমি কীর্তনে বাধা দি। অনেক অত্যাচারও করেছি। তাই ভয় হয়েছিল তুমি বুঝি রাগ করে আসছ! এখন তুমি শান্ত হয়েছে, তাই সাহস করে বেরিয়ে এলুম। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো যেহেতু আমি তোমার মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্পর্কে আমার চাচা। তিনি তোমার নানা। কাজেই আমি তোমার মামা। মামা যদি অপরাধ করে থাকে, ভাগনের উচিত ক্ষমা করা। তুমি ভাগনে, আমার বাড়িতে এসেছ, এ তোমারই বাড়ি। তোমাকে আর কী অভ্যর্থনা করব!'

নিমাই বললেন, 'তোমার সঙ্গে যে আমার গোটা কতক কথা আছে। প্রথম কথা, কোন অপরাধে তুমি আমাদের কীর্তন বন্ধ করলে? আবার যদি বন্ধই করলে, হঠাৎ এমন কি হল, টহলদারি অত্যাচার সবই কেমন যেন কমে গেল। বন্ধই হয়ে গেল। কারণটা কি?'

কাজি বললেন, 'তোমাকে সবাই গৌর-হরি বলে ডাকে, আমিও তোমাকে সেই নামেই ডাকব। গৌরহরি। শোনো গৌরহরি, কীর্তনরোধে ক্ষান্তি দেওয়ার কারণটা শোনো। সেই কারণটা সকলের আড়ালে আমি শুধু তোমাকেই বলব।'

নিমাই বললেন, 'এরা সবাই আমার নিজের লোক। কারণটা এরাও শুনুক।' তখন কাজি বললেন, 'কীর্তন বন্ধ করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না; কিন্তু আমার লোকজন ভীষণ বিরক্ত করতে লাগল। তারা বললে, কীর্তন যদি বন্ধ না করি, তাহলে বাদশা আমার ওপর রাগ করবেন। এতেও আমি বন্ধ করতুম না, শেষে তোমাদের অনেক হিন্দু এসে আমাকে চাপ দিতে লাগল। তারা বললে, নিমাই পণ্ডিত নতুন মত চালাতে চাইছেন। সে-মত হিন্দুধর্মের বিরোধী। হিন্দুরা মনে মনে জপ করে। এমন হইহই করে নাম করলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুধর্মের সর্বনাশ হতে চলেছে। রাজার কর্তব্য নিমাইকে দমন করে আমাদের ধর্ম বাঁচান।'

হিন্দুরা কাজিকে কি বলেছিলেন, চরিতামৃতে আছে,

'গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জন।।'

কাজি বলছেন, 'হিন্দুদের চাপে আমাকে কীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করতে হল। তবে কাজটা আমার নিজেরই ভাল লাগল না। তারপর সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখছি, নরসিংহ। তর্জন-গর্জন করছেন। আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। এরপর আমি যাদের নাম বন্ধ করার জন্যে পাঠালুম তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাম নিয়ে ফিরে এল। নাচছে আর গাইছে, 'হরি হরি', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। প্রথমে ভাবলুম হিন্দুদের বিদ্রূপ করছে। তারপর দেখলুম সব যেন ভূতগ্রস্ত। খুব ধমক দিতে বললে, কীর্তনে বাধা দিতে গিয়ে নাম ভেতরে ঢুকে গেছে। মুখে সদাসর্বদা হরিনাম, কৃষ্ণনাম। যাকেই পাঠাই তারই ওই এক অবস্থা। তখন ভাবলুম, বাধা দেওয়া অন্যায় কাজ। নামে ঐশ্বরিক শক্তি আছে। মানুষ নাম ধরে না, নামই মানুষকে ধরেন।'

কাজি বলছেন আর নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে মনে ভাবছেন, 'কে তুমি?' আমার শরীরে হঠাৎ এই শিহরন কেন? এত আনন্দের ঢেউ! দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাজি যেই ভাবলেন, 'তুমিই কি সেই?'

মহাপ্রভুর চোখে ইঙ্গিতে খেলে গেল, 'আমিই সেই তিনি।'

কাজি আর মনের ভাব চেপে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'গৌরহরি আমার ধারণা, হিন্দুরা যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন, তুমিই সেই নারায়ণ।' তখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজির একটি আঙুল স্পর্শ করে বললেন, 'তুমি যখন মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করেছ, তখন তোমার পাপ ক্ষয় হল।'

কাজি কাঁদছেন। হঠাৎ তিনি কাটা কলাগাছের মতো মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে গেলেন, 'প্রভু! তোমার উপর যাতে আমার ভক্তি হয়, তুমি আমাকে সেই কৃপা করো।'

নিমাই ধীরে ধীরে চাঁদকাজিকে দু-কাঁধ ধরে ওঠালেন। বললেন, 'তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা, তুমি বল, কীর্তনে আর কোনো দিন বাধা দেবে না!'

কাজি বললেন, 'বাপরে! আমি তো দেবই না, আর আমার বংশের প্রত্যেককে আমি এই হুকুম করে যাব, তারাও যেন কীর্তনে বাধা না দেয়।' এই অঙ্গীকার পেয়ে মহাপ্রভু পথে নেমে এলেন। হরিনামের ঢেউ উঠল। আবার

নৃত্য। কাজিও ভাবে বিভোর। তিনিও নাম করছেন, 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।' তিনিও অনুসরণ করে আসছেন। নৃত্য করছেন। প্রভু তাঁকে শান্ত করে বললেন, 'এইবার আপনি বাড়ি যান। বিশ্রাম করুন।'

বাদশাহের দৌহিত্র চাঁদ কাজি গৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্মসনাতন বলে বিশ্বাস করতেন। হিন্দুরা তাঁকে সমাজে গ্রহণ না করলেও তিনি ও তাঁর বংশের সকলে আচার-ব্যবহারে হিন্দুর মতো হয়ে গেলেন। গৌরহরিকে উপাসনা করতে লাগলেন।

সংকীর্তনের দল ফিরে চলল। সেই রাতে নবদ্বীপের সমস্ত পথ আচ্ছাদিত হয়ে রইল খই আর ফুলে। বাতাসে ছড়িয়ে রইল হরিনাম।

মহাপ্রভুর সংগ্রাম শেষ। পাঠানের অস্ত্র আর ভগবানের প্রেম। সম্মুখ সমরে। অস্ত্র নিরস্ত্র হল। দর্পীর দর্প হরণ, অহঙ্কারীর অহঙ্কার হরণ, জ্ঞানগর্বীর গর্ব হরণ করে কৃপায় ভরে দিতেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।

রামকেলীতে সনাতনের সাবধানবাণীতে শ্রীচৈতন্য মৃদু হাসলেন। কাল চলে গেছে কালে। নবদ্বীপের পথে পথে আর ফুল নেই, কাঁকর। গৌরের গৌড়লীলা শেষ। গৌরাঙ্গকে সবাই পেয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়! কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই!

মহাপ্রভুর সেই সময়ের অবস্থা, জগত থেকেও জগতে নেই। বহু মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছে। অহরহ নামসংকীর্তনে চতুর্দিকে মুখর। খেয়াল ছিল না এসব। সনাতনের কথায় বাস্তবে এলেন।

মহাপ্রভু বললেন, 'আমি তাহলে শ্রীক্ষেত্রে চলে যাই। যাওয়ার আগে তোমাদের দু-ভাইয়ের নামদুটি পালটে দিয়ে যাই। 'সাকরমল্লিক', তোমার নাম হল সনাতন। আর 'দবিরখাস', তোমার নাম হল 'রূপ'। আর শোনো, তোমরা পুরীতে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

রাতের অন্ধকারে মহাপ্রভু রামকেলী ছেড়ে চলে গেলেন। সেই রাতে রূপ ফিরে এলেন গৌড়ে। মনে বইছে অন্যমধুর বাতাস। তবু কিছু রাজকার্য করতেই হল। তারপর শয়ন বিশ্রাম। মাঝরাতে বিষাক্ত কোনো পোকার কামড়ে যন্ত্রণায় উঠে বসে স্ত্রীকে বললেন, 'আলো জ্বালো। শিগ্‌গির আলো।' হাতের কাছে বাতি খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষে তিনি স্বামীর একটি বহুমূল্য পোশাকে আগুন ধরিয়ে দিলেন। যন্ত্রণাকাতর স্বামীকে কি কামড়াল দেখতে হবে তো!

রূপ বললেন, 'তুমি এ কি করলে? আমার এই বহুমূল্য পোশাকে আগুন ধরিয়ে দিলে?'

তিনি বললেন, 'তোমার ইষ্ট, তোমার নিরাপত্তা তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য আমার

কাছে আগে, তারপরে ঘর-বাড়ি, পোশাক-আশাক, ধনদৌলত।' কথাটা মর্মে পৌঁছল। 'একেই বলে প্রভুর সেবা। সর্বস্ব দিয়ে করতে প্রস্তুত। আমার প্রভুকে তো পেয়েছি। শ্রীচৈতন্য। সব বিসর্জন দিয়ে এই রকম মন নিয়েই তো তাঁর অনুগামী হতে হবে। মন প্রস্তুত। ধন্য রমণী! তুমি আমার পথ খুলে দিলে।'

বিপুল বিষয়ের এক-চতুর্থাংশ দিলেন ব্রাহ্মণদের, এক চতুর্থাংশ দুঃখী-দরিদ্রদের অপর দুই অংশের এক অংশ পরিবারবর্গকে আর অপরাংশ দিলেন সনাতনকে। সেই খতের সঙ্গে রইল একটুকরো কাগজ, সেই কাগজে লেখা একটি শ্লোক 'যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গাতাত্তরকোশলা!'

সেই রাতেই সন্ন্যাসী হয়ে রূপ গৃহত্যাগ করলেন। চলে গেলেন পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে। 'রূপ' চলে গেল! সনাতন রূপের পাঠান কাগজের টুকরোয় লেখা সেই শ্লোকটি বারে বারে পড়ছেন। মহাপ্রভু তাঁর মন, চিন্তা, ভাবনা সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছেন। সিংহাসনে তুর্কি নাচ। যুদ্ধ, লুট, গলাকাটা অনেক দেখা হল। আর নয়। মহাপ্রভু মহাজীবনের সন্ধান রেখে গেছেন, এখন রূপের মতো বেরিয়ে পড়া। মূল ধারায় গিয়ে মেশা।

সনাতনের পরিবর্তন রাজার চোখে পড়েছে। রাজকাজে মন নেই। উড়ু উড়ু ছাড়া ছাড়া ভাব। এটিও রূপের পথ ধরবে না কি? হিন্দুরা যাঁকে নিমাই, গৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য বলে, তাঁর কি এমন ক্ষমতা! ঘোড়া নেই, তরোয়াল নেই, মুখে হরি, লক্ষ লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে নাচতে নাচতে চলল।

সনাতনকে ডাকলেন। 'শোনো সাকরমল্লিক, তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে।' সনাতন স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন, 'আপনার যুদ্ধ মানে তো দেবমন্দির ভাঙা আর হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট করা। আমাকে মার্জনা করবেন। সঙ্গে আপনার কোনো মুসলমান মন্ত্রীকে নিয়ে যান।'

হুসেন শাহ খুব রেগে গেলেন, মুখে কিছু বললেন না। সনাতন রাজসভায় আসা প্রায় বন্ধই করে দিলেন। কী হয়েছে? শরীর ভাল যাচ্ছে না, অসুস্থ। হুসেন শাহ রাজবৈদ্যকে পাঠালেন। বৈদ্য এসে জানালেন, কোথায় অসুখ! বিলকুল সুস্থ।

সনাতনকে ধরে এনে কারাগারে পোরা হল। প্রধানমন্ত্রীর জেল। হুসেন শাহ গৌড় ছেড়ে যুদ্ধে চলে গেলেন। সনাতনের পরিবারবর্গ কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলকে সাতহাজার টাকা ঘুষ দিলেন। মুক্তির পরিকল্পনা তৈরি হল। বন্দীদের মাঝে মাঝে গঙ্গা-স্নানে নিয়ে যাওয়া হত। সনাতনও সেইভাবে স্নানে গেলেন। একটি নৌকা তৈরি ছিল। গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী সনাতন পালালেন। মীর হাবুল সতর্ক অনুসন্ধানের একটা তামাশা করলেন। তাঁকেও তো বাঁচতে হবে। কোথাও

পাওয়া গেল না। বোধহয় ডুবেই গেছেন!

সঙ্গে ভৃত্য ঈশান। সনাতন সন্ন্যাসীর বেশে গৌড় ছেড়ে পালাচ্ছেন। ঈশান সঙ্গে পনেরটি মোহর নিয়েছিলেন লুকিয়ে। তাঁরা দুজনে গঙ্গা পার হলেন। হাঁটছেন। অদূরেই একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়টির নাম পাত্র। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি পল্লী। সেখানে এক ভুঁইয়ার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। অতিরিক্ত আপ্যায়ন আর আদরযত্ন দেখে সনাতনের সন্দেহ হল। ঈশানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে না কি?'

ঈশান বললে, 'পনেরোটি মোহর।'

'এক্ষনি ভুঁইয়াকে দিয়ে দে।'

পনেরোটি মোহর হাতে পেয়ে ভুঁইয়া অকপটে বললে, 'দিয়ে ভালই করলেন, তা না হলে আজ রাতেই আপনারা খুন হতেন।'

ভুঁইয়ার আবার দয়ার শরীর। দয়ালু খুনী। একটি মোহর ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'এটি আপনাদের পথ-খরচ।'

সনাতন সেই মোহরটি ঈশানকে দিয়ে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। শুরু হল কপর্দকশূন্য মহামন্ত্রীর পথযাত্রা। কৌপীন মাত্র সম্বল। ভারতকে একবার কেন, একশোবার জয় করা যেতে পারে, ভারতীকে কে জয় করবে? ভারতী মানে, ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা। এ যে কৃষ্ণক্ষেত্র।

সে কেমন? এই যে সামান্য এক রমণী সনাতনের বৈরাগ্যের যে-টুকু বাকি ছিল, সে-টুকু সম্পূর্ণ করে দিলেন!

সমগ্র বাঙলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রধানমন্ত্রী কৌপীন পরে একা ছুটছেন মহাপ্রভু-মিলনে। পথে বিশাল এক প্রান্তর। এইবার একটু বিশ্রাম। প্রখর রোদে অনেক হেঁটেছেন। মাটির ঢেলা সাজিয়ে তৈরি করেছেন মাথার বালিশ আর পাশ বালিশ। শুয়েছেন সনাতন। চোখ বুজে আসছে পথশ্রমে।

জল আনতে চলেছেন এক রমণী। দৃশ্যটি তাঁর চোখে পড়ল। তিনি সনাতনকে ঠাট্টা করে বলে গেলেন, 'সন্ন্যাসী হয়েছেন; কিন্তু ভোগের অভ্যাস এখনো যায়নি দেখছি! সনাতন তাড়াতাড়ি উঠে বসে সেই মহিলাকে বললেন, 'মা! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার চোখ খুলে দিলে।'

এক গণিকা, চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলবাবুর আসক্তি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার এই ভয়ঙ্কর টান এক অতি তুচ্ছ বেশ্যার জন্যে! এই টানে তো তুমি কৃষ্ণকে পেতে পার ঠাকুর! ঝড়ের রাতে কৃষ্ণ অভিসারে বৃন্দাবনে চলে গেলেন বিল্ব-মঙ্গল। নাগর হলেন রিক্ত সন্ন্যাসী।

সনাতনকে পরীক্ষা করে এসে হাকিম হুসেন শাহকে বলেছিলেন, 'জনাব, হিন্দুলোকের বিচমে কি হাওয়া আয়া—গোরা গোরা বোলকে বহুত আদ্‌মি এস্‌ মাফিক দেওয়ানা হোতা।'

হুসেন শাহ-র রাজত্বকে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে মহাপ্রভু কাল ছেড়ে মহাকালে চলে গেলেন। ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, লোকাচারের জগতে, সংগীতে এমন কি খাদ্যেও এমন এক ঢেউ তুলে দিলেন, অস্ত্রধারী অশিক্ষিত শাসকের দল বড় বেমানান হয়ে পড়লেন। আমাদের অন্তরঙ্গ জীবনে তাঁরা বহিরঙ্গই থেকে গেলেন। কেকের গায়ে ছোট-বড়, লাল-কালো পিঁপড়ের মতো।

রূপ আর সনাতন বৃন্দাবনে। তাঁদের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত ভারতে তখন কেউ ছিলেন না। অথচ কোনও অহঙ্কার নেই। দীন হীন দুই বৈষ্ণব। সম্রাট আকবর এঁদের সঙ্গে দেখা করে বড় প্রীতিলাভ করেছিলেন। হিন্দু রাজাদের বৃন্দাবনে বড় বড় মন্দির নির্মাণের ঢালাও অনুমতি দিলেন। মহাপ্রভুর গুণকীর্তনে মুগ্ধ সম্রাট আকবর গৌরসুন্দরের উপর একটি হিন্দি কবিতা লিখেছিলেন।

সূর্য অস্ত যাবে এইবার। গোধূলি ঘনায়। মোগলদের দিল্লির-দাঁত ভাঙছে। বৃদ্ধ আরঙ্গজীব দীর্ঘ দাপাদাপির শেষে মৃত্তিকা গহ্বরে চিরঘুমে চলে গেছেন। বেমক্‌কা এক দুধার অশ্বারোহী দিল্লির তোরণদ্বারে। নাদির শাহ।

আরঙ্গজীব যেদিকে পেরেছিলেন সেই দিকেই সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ফলে মোগলসাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল একটি ঢিলেঢালা পোশাকের মতো। নব্বই বছরের বৃদ্ধ সম্রাট। সতেরটি সন্তান। তারাও প্রবীণ। সম্রাট জানতেন মোগলদের কুখ্যাত ধারা। সিংহাসনে বসবে একজন বাকি ষোলজনকে মরতে হবে। 'আজমস্ত হামা ফাসাদ-ই-বাকি'। আমার মৃত্যুর পর সব লণ্ডভণ্ড,

নিমেষে, মুহূর্তে, শ্বাসে
দুনিয়া বদলে যায়
বাতাস যেমনই চলুক
ভাসাই তরণী জলে।।

সেদিন শুক্রবার। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ৩ মার্চ, ১৭০৭। আহমদনগর। সকাল নটা। চলে গেলেন সম্রাট আরঙ্গজীব। দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এল। এত কালো যে, কে কোথায় যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না। একজন আর একজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। বীভৎস ঘূর্ণিঝড়। সমস্ত তাঁবু উড়ে গেল। ধুলোয় দমবন্ধ হয়ে বহু মানুষ ও প্রাণী মারা গেল। বহুগ্রাম ধ্বংস হল। গাছপালা সব ভেঙে পড়ল। চলল সন্ধে ছটা পর্যন্ত।

উপাধানের তলায় পরবর্তী উত্তরাধিকারীর জন্যে একটি নির্দেশ লিখে রেখে

গিয়েছিলেন, 'নিজের ছেলেদের বিশ্বাস করো না, যতদিন বাঁচবে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করবে না। শাসনের মূলস্তম্ভ হল সাম্রাজ্যের কোথায় কী ঘটছে তার খবর রাখা। সামান্যতম উদাসীনতায় বিপর্যয়!'

ভারত এবার কার হবে। তিনটি শক্তি মুখিয়ে আছে, আফগান, মারাঠা আর পারসী। প্রথমেই পারস্য। সে এক মহাবীর নাদির শাহ। বর্ম, শিরস্ত্রাণভূষিত, অস্ত্রধারী সেই অশ্বারোহী। তাঁর ছবি দেখলেই মনে হবে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

পারস্যের 'সাফাবিদ' রাজ্যের টলটলায়মান অবস্থা। চারপাশ থেকে তেড়ে আসছে আফগান, রাশিয়ান, তুর্কোমান এবং তুর্কিরা। পারস্যরক্ষায় নাদির শার আবির্ভাব। মার মার করে সব কটাকে তাড়ালেন। রাজ্যের পূর্ব সীমান্তকে দৃঢ় করতে গিয়ে ঢুকে পড়লেন ভারতে। দিল্লির পতন হল। শুধু পতন নয় ছারখার।

নাদির কি আরও এগোবেন? বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা!

১৭৩৯। নাদির শা দিল্লি গুঁড়ো করছেন, আর বঙ্গে মসনদে বসছেন এক ফিনফিনে নবাব সরফরাজ খাঁ। তাঁর হারেমে ১৫০০ রমণী। দিন-রাত ফুর্তি। মদ খেতেন না। মদে বেহুঁস করে। হুঁসে থেকে রমণী সম্ভোগ।

নাদির শার ভয়ে তাঁর নিজের সিংহাসন কেঁপে উঠল। দিল্লি থেকে দুরন্ত ঘোড়ায় তুরন্ত বাঙলায় চলে এলে কে বাঁচাবে! রাজ্য নয় সুন্দরী রমণীতেই তাঁর আকর্ষণ। চর এসে কোনো সুন্দরী রমণীর খবর দিলে যতক্ষণ না ধরে আনছে সরফরাজ উন্মাদের মতো ব্যবহার করতেন।

নাদিরের ভয়ে বাঙলার তিন সনের বাকি খাজনা তাঁর কাছে তড়িঘড়ি পাঠিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় নাদির শার নামাঙ্কিত মুদ্রাও চালু করে দিলেন। যতটা সন্তুষ্ট করে রাখা যায় সেই দুর্মদকে।

ইতিমধ্যে বাংলার ভাগ্যকোষ্ঠীতে দুটি গ্রহ ঢুকে পড়েছে আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠ। সুজাউদ্দিন মরণকালে পুত্র সরফরাজকে বলে গিয়েছিলেন তিনজনের পরামর্শে সব কাজ করবে, হাজি আহম্মদ, আলমচাঁদ আর জগৎ শেঠ।

এই তিনজন সুজাউদ্দিনের খুব প্রিয় ছিলেন। আলমচাঁদকে 'রায় রাঁয়া' উপাধি দিয়েছিলেন। এই তিনজনের পরামর্শেই সব কাজ করতেন। এঁদের তৎপরতায় বঙ্গের রাজেস্ব এক বছরের মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ থেকে এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় উঠেছিল।

বাংলার আকাশে শেষ নক্ষত্রটিও উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে আলিবর্দি খাঁ। দুই সেনাপতি আলিবর্দি আর মির হবিব! আলিবর্দি পাটনাই দস্যুদের বাগে এনেছিলেন। আর মির হবিব ত্রিপুরার রাজভাণ্ডার লুঠ করে প্রচুর সম্পদ এনে

দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশের নাম হয়েছিলেন 'রোসনাবাদ'।

সরফরাজ প্রথম প্রথম এঁদের কথা মতোই চলতেন, তারপর হঠাৎ সাবালক হয়ে গেলেন। হাজি আহম্মদের নাতি ও নাতনীর বিয়ে ভেঙে দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন জোর করে। জগৎ শেঠের অপূর্ব সুন্দরী পুত্রবধূকে দেখে পাগল হয়ে গেলেন। জগৎ শেঠ বাধ্য হলেন মেয়েটিকে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাতে। এই বিশ্রী ঘটনায় শেঠজির উচ্চ-কুলগর্ব খর্ব হল।

এদিকে দিল্লিতে নাদির শা এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। দিল্লির সিংহাসনে মহম্মদ শাহকে বসিয়ে মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে যাঁর নামতে ইচ্ছে করে না, সিংহাসনে তিনি স্থির হয়ে বসেন কী করে!

বোকা ছেলেটার দিন ঘনিয়ে এল। মসনদ ঘিরে শত্রুর অভাব নেই।

সরফরাজের নামে দিল্লিতে মহম্মদ শাহের দরবারে নালিশ জানাতে ডেপুটেশানের পর ডেপুটেশান। নাদির শার প্রতি পক্ষপাতিত্ব। স্বয়ং সম্রাটকে অবজ্ঞা। তাঁরা সম্রাটের কান ভারি করতে লাগলেন। প্রস্তাব দিয়ে এলেন, বেঅকুফটাকে হাটিয়ে হাজি আহম্মদের ভাই আলিবর্দীকে নবাব করে দিন। সে আপনাকে প্রচুর টাকা এনে দেবে। আলিবর্দী তখন পাটনার শাসনকর্তা। মহম্মদ সাহ গোপনে আলিবর্দীকে বাঙলার গদি দখলের জন্যে নিয়োগপত্র দিলেন।

জগৎ শেঠের কেরামতি শুরু হল। সঙ্গে হাজি আহম্মদ। তাঁরা নবাবকে কু-পরামর্শ দিলেন। শুধু শুধু এত সৈন্য পোষার কী দরকার। সৈন্য সংখ্যা কমালে খরচ অনেক কমবে। তাঁরা বহু সৈন্য ছাঁটাই করে দিলেন। আলিবর্দী বাহ্য রাজভক্তিতে ভরা চিঠি লিখতেন, আর জগৎ শেঠের মিষ্টি মিষ্টি কথা। বোকা সরফরাজ তাঁর দেড়হাজার বাঁদী নিয়ে ফুর্তিতে আছেন।

এইবার আলিবর্দী তাঁর বিপুল বাহিনী নিয়ে পাটনা থেকে বেরলেন। ছুতো-ভোজপুরীদের বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছেন। পথের এক জায়গায় তাঁবু ফেলেছেন। ডেকে পাঠালেন এক মৌলবী ও এক ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি ও তুলসীপাতা। মৌলবীর হাতে কোরাণ। সেনাপতি ও সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। মুসলমানদের বললেন, কোরান স্পর্শ কর, হিন্দুদের বললেন, গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করো। এইবার প্রতিজ্ঞা করো, 'আলিবর্দী যা বলবে, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক আমরা তা পালন করব।'

শপথ নেওয়ার পর আলিবর্দী তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। আমরা যাচ্ছি নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। হাজি মহম্মদ, আলিবর্দী আর জগৎ শেঠ এত কায়দা করে পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন মন্ত্রগুপ্তি, যে কাক-পক্ষীও টের পায়নি।

আলিবর্দী তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন রাজপ্রাসাদের অদূরে সরফরাজ তখনও বিশ্বাস করতে পারেননি যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে বা হতে পারে।

আলিবর্দী তাঁর শিবির থেকে কামান দেগে জানান দিলেন, আমি তোমার বন্ধু নই পরম শত্রু। অসহায় নবাব তখনও পর্যন্ত যাঁরা বিশ্বস্ত তাঁদের বললেন, মনে হচ্ছে যুদ্ধ!

হ্যাঁ জাঁহাপনা, যুদ্ধ। নবাব হাতির পিঠে উঠলেন। যুদ্ধ করবেন। মাহুত আলিবর্দীর সৈন্যসংখ্যা দেখে সরফরাজকে বললেন, অসম্ভব! এ-যুদ্ধে আপনার প্রাণ যাবে। বিপক্ষে হাজার হাজার সৈন্য। এখনও সময় আছে। হাতি ছোটাই বন বিষ্ণুপুরের দিকে। রাজা গোপাল সিংহের প্রবল প্রতাপ। তাঁর সাহায্যে এই বিশ্বাসঘাতকদের পরাস্ত করা যেতে পারে। নবাব ওই পরামর্শ শুনলেন না। আলিবর্দীর হাতে প্রাণ দিলেন। বিদায় নিলেন এক বছরের নবাব।

সিংহাসনে আলিবর্দী। থাকবেন মাত্র ছ'বছর। তারপর আসবেন স্নেহের দুলাল, পরমসুন্দর, তরুণ সিরাজউদ্দৌলা। মাত্র চার মাস। তারপর পলাশী। দিল্লিতে আরও একশ বছর, গোলেতালে। তারপর বাংলার সাতান্ন, দিল্লির ১৮৫৭। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনানী হডসন, কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে মাত্র তিনটি গুলি খরচ করলেন। একদিন যেখানে দারার খণ্ডিত দেহ লুটিয়ে পড়েছিল, সেই ভূমিতে রইল পড়ে তিনটি দেহ। তিনটি নাম, শাহজাদা মির্জা মুঘল, শাহজাদা মির্জা কুরেশ সুলতান, আর শাহজাদা মির্জা আবু বখত। শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পুত্রদ্বয় ও পৌত্র। বৃটিশ এম্পায়ারের ভিত পড়ল।

আমরা কালের যাত্রাপথে আলিবর্দীকে পেলুম। এইবার সেই ব্রাহ্মণটির কাছে যাই, পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র। আলিবর্দী সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মুর্শিদাবাদের সাঁকাসা থেকে চলে এসেছেন রাধানগরে। সুবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাটের কাছে বাড়ি করেছেন। বড় সুখে আছেন, বড় সুন্দর আছেন। তাঁর তিন পুত্র-সন্তান, অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ। ব্রজবিনোদ তাঁর কনিষ্ঠপুত্র।

এই ব্রজবিনোদকে আমাদের প্রয়োজন। তিনি দাঁড়িয়েছেন এক যুগসন্ধিতে। আলিবর্দী বেরিয়ে গেছেন। সিরাজ সিংহাসনে। কাটামুণ্ড গড়াল বলে। ব্রজবিনোদ নবাবের চাকরিতেই ছিলেন। সিরাজ তাঁকে অসম্মান করায় পদত্যাগ করেছিলেন।

পলাশীর মামলা মিটে গেল। ক্লাইভ বুট পায়ে তোপ নিয়ে ঘুরছেন। সাগর পার থেকে ভেসে আসছে বৃটিশ সিংহের গর্জন। রাধানগরের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে না। বাঁশঝাড়ের বাঁশের ডগায় শ্যামাপাখি লেজ নাচিয়ে শিস দিচ্ছে। কলাগাছে কাঁদি ঝুলছে। মন্দিরে মন্দিরে আরতি। শ্রীপাটে হরিনাম সংকীর্তন।

কয়েকদিন ধরেই ব্রজবিনোদ অসুস্থ। কবিরাজ মশাই নাড়ি ধরে মৃদুগলায় বললেন, 'এবার যে সময় হল যাওয়ার। ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।'

ব্রজবিনোদ মৃদু হেসে বললেন, 'সে আমিও বুঝতে পারছি। মন উঠে গেছে। পুঁটলি বাঁধা সংসার পড়ে আছে একপাশে।'

কবিরাজ মশাই চলে যাওয়ার পর ব্রজবিনোদ ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, 'পালকি কি এসেছে?' পালকি এসেছে। সবাই স্বাভাবিক কারণেই বিষণ্ণ। বাড়ির কর্তা পালকিতে আরোহণ করে চিরতরে চলে যাচ্ছেন। সাতপুত্র চলেছেন আগে পিছে। ব্রজবিনোদ যাবেন শ্রীরামপুরে গঙ্গার তীরে। সেখানে দান-ধ্যান করবেন। পরম বৈষ্ণব তিনি। হরিনাম শুনবেন। হরিনাম করবেন। অবশেষে এসে যাবে বৈতরণীর তরি।

শ্রীরামপুরের গঙ্গার তীরে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। সেই দিন, সেই সময়ে অঙ্ক মেলেনি। মিলবে পরে। তখন এইরকম মনে হবে, পর্দার আড়ালে কে তুমি বসে!

শ্রীরামপুরের চাতরার এক ব্রাহ্মণ শ্যাম ভট্টাচার্য ভিক্ষার্থী হয়ে ব্রজবিনোদের কাছে এলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। দেশগুরু। যথেষ্ট খ্যাতি। তিনি কী চাইতে পারেন? তাঁর কিসের অভাব!

ব্রজবিনোদ বললেন, 'বলুন ব্রাহ্মণ, কী প্রার্থনা আপনার?'

'আগে বলুন, যা চাইব আপনি দেবেন।'

ব্রজবিনোদ চলে যাচ্ছেন। এখন তো তাঁর অদেয় বলে কিছু নেই। সামর্থ্যে কুলোলে অবশ্যই দেবেন। ব্রজবিনোদ বললেন, 'অবশ্যই।'

শ্যাম ভট্টাচার্য বললেন, 'আপনার একটি ছেলে।'

'তার মানে? আমার একটা ছেলে নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'জামাতা। আমার কন্যাটিকে আপনার সেই পুত্রের হাতে সম্প্রদান করব।'

ভীষণ দ্বিধায় পড়লেন ব্রজবিনোদ। তিনি ঘোর বৈষ্ণব, আর শ্যাম ভট্টাচার্য ঘোর শাক্ত, ভঙ্গকুলীন। এমন প্রার্থনা কেমন করে মঞ্জুর করা যায়! কিন্তু কথা দিয়েছেন। মা গঙ্গা সাক্ষী।

ব্রজ বিনোদ বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

বঙ্গে তখন শাক্ত আর বৈষ্ণবদের মধ্যে ঘোর কোঁদল। কে কাকে ছোট করতে পারে! বৈষ্ণবদের বক্তব্য, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!'

শাক্তদের উত্তর, 'শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন। তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী-তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ওই কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্যে।'

ব্রজবিনোদ একে একে ডেকে পাঠালেন তাঁর সাতপুত্রকে। তাঁদের মত চাইলেন। কে ইচ্ছুক শাক্ত ব্রাহ্মণের কন্যাটিকে গ্রহণ করতে। সাত পুত্রের ছ'জনই অসম্মতি জানালেন। কে জানে কেন পঞ্চমপুত্র রামকান্ত পিতৃসত্য পালনে বড় আনন্দের সঙ্গেই এগিয়ে এলেন। রামকান্ত বললেন, আমার আপত্তি নেই। আমি গ্রহণ করব।

একে আমরা কি বলব! বিধি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত! এখনই নয়। পরে বুঝতে পারবা আরোহী! আগে বাড়ো। বাইবেলের একটি অংশ উদ্ধৃত করার লোভ যে সামলানো যাচ্ছে না,

To every thing there is a senson, and a time to every purpose under the heaven : A time to be born and a time to die (সময় হল জন্মাবার। সময় হল মরবার) ; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted (সময় হল রোপণের, সময় হল আহরণের) A time to kill, and a time to heat ; (সময়ে মেরেছি, সময়ে সেরেছি) a time to break down, and a time to build up; (সময় ভেঙেছে, সময়ই গড়েছে)। A time to weep, a time to laugh (সময় এল কাঁদার, আবার সময় এল হাসার); a time to mourn. and a time to dance ; (শোকের সময় পার করেই কিছুকাল নাচরে সময়) ; A time to castaway stones, and a time to gather stones together (সময়ে পাথর ছুড়ে ছুড়ে ফেলা, আবার সময়ে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করা) ; a time to embrace, and a time to refrain from embracing (সময়ে আলিঙ্গন, সময়ে দূরে ঠেলা)। A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to castawa. (সময়ে সংরক্ষণ, আবার সময়ে দূ' করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া)। Atime to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak. (সময়ে চড়চড় করে ছেঁড়া, সময়ে বসে বসে সেলাই করা, সময়ে নীরব, সময়ে কত কথা)।

A time to love, and a time to hate ; A time of war, and a time of peace. (কখনো ভালবাসা, কখনো ঘৃণা, কখনো যুদ্ধ, কখনো শান্তি)।

সময়! চলো, চলো, ঘটনার উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে। ব্রজবিনোদ বড় কম মানুষ নন। আলিবর্দীর দরবারে তাঁর বহু সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। ধনী, দাতা, ধর্মপ্রাণ। পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে শাহ্ আলম (দ্বিতীয়)। সম্রাট হওয়ার আগে ও পরে তিনি এই পূর্বাঞ্চলে এসেছিলেন। বাদশাহের সঙ্গে ব্রজবিনোদের খুব খাতির হয়েছিল। নানা কাজে, নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

পিতার সত্যরক্ষার জন্যে রামকান্ত বিবাহ করলেন তারিণী দেবীকে। সেই সময়ে কাজটি বড় সহজ ছিল না। শ্যাম ভট্টাচার্য সৎ, পণ্ডিত ; কিন্তু তিনি বৈষ্ণব নন, শাক্ত। তিনি কুলীন নন, ভঙ্গ কুলীন।

রামকান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ, পিতার মতোই সৎ, ধর্মপ্রাণ, তেজস্বী। কুলদেবতা গোপীনাথের ভক্ত। নবাব সরকার কিছুদিন চাকরি করেছেন! সহ্য হয়নি। বর্ধমান-রাজের কাছ থেকে কিছু সম্পত্তি ইজারা নিয়ে সংসার চালান। ইতিমধ্যে একবার বিবাহ করেছেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম সুভদ্রা দেবী। নিঃসন্তান। তারিণী দেবী হলেন দ্বিতীয়া। রামকান্ত আরো একবার বিবাহ করবেন। তৃতীয়া পত্নীর নাম হবে রামমণি।

দুই

রায় পরিবারে তারিণী দেবী এলেন। শাক্তের শক্তি নিয়ে বৈষ্ণবের প্রেমে। অতি সুন্দরী। স্বভাবেও সুন্দর। কর্মঠ। আদর্শপরায়ণ। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। হিন্দু যৌথ পরিবারে সব পাওয়া যেতে পারে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, উদয়াস্ত খেটেও ভালবাসা পাওয়া সহজ নয়। সেই দুর্লভ প্রাপ্তিই ঘটল তারিণীর ভাগ্যে। ঘরে বাইরে তাঁর নতুন নাম হল, 'ফুল ঠাকুরাণী।'

এক ধারা থেকে আর এক ধারায় এসে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাঁর এতটুকু অসুবিধে হল না। অসাধারণ বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণা। কোনো রকম মিথ্যা কথা সহ্য করতে পারতেন না, কুৎসিত, গ্রাম্য ব্যবহার তাঁর অসহ্য ছিল। অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী বলে অসম্ভব একরোখা ও কষ্টসহিষ্ণু।

দেখতে দেখতে ফুলঠাকুরাণীই হয়ে উঠলেন সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। শাক্ত পরিবারের নিয়মকানুন, আহারাদি একরকম, বৈষ্ণবপরিবারের সম্পূর্ণ অন্যরকম। সারা বছর নানা উৎসব। বধূটি অতি সুন্দরভাবে নিজেকে বদলে ফেললেন। সেই পরিবর্তনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আন্তরিকতা, স্বামীর প্রতি অসাধারণ এক ভালবাসা ছিল, তা না হলে এমন হতে পারত না। স্বামীর ধর্মই তাঁর ধর্ম হল, স্বামীর ইষ্টই হল তাঁর উপাস্য দেবতা। মা কালীর স্থানে এলেন বিষ্ণু। শ্যামা হলেন শ্যাম। খাঁড়ায় জায়গায় বাঁশি। মুণ্ডমালা নয়, ফুলমালা। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সরকারের জমিদারি দেখাশোনা করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। রাধানগরে সবাই তাঁকে শিকদার বাবু বলতেন। তিনি একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় মানুষ সেটিকে বলেন, 'শিকদারপুকুর'। ফুল ঠাকুরাণী যখন এই শিকদারপুকুরে যান, ধীর পায়ে, দৃপ্তভঙ্গিতে, তখন গ্রামের মানুষ বলতে থাকেন, ঠিক পরিবারেই ঠিক মানুষটি এসেছেন। শিকদার পরিবারের দেবী।

রামকান্ত আর তারিণী দেবী সাধারণ এক দম্পতি। পয়সা আছে, প্রতিপত্তি

আছে। সজ্জন, ধার্মিক। অষ্টাদশ শতকের এক নামী পরিবার। রাধানগরে বসবাস করেন। এই রকমই মনে হতে পারে। এর অন্তরালে আর একটি ব্যাপার আছে, সেটি হল যুগপ্রয়োজন সাধন। তাঁরা এক মহামানবকে ইতিহাসে আনতে চলেছেন। তাঁরাও জানেন না। যা জানেন, সংসার ধর্ম পালন করতে এসেছেন। জীবন শেষ সংসার শেষ। নদীতে স্নান সেরে ঘাটে উঠে ঘরে ফেরা।

প্রথমে একটি কন্যা। নামটি হারিয়ে গেছে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল, উচ্চবংশীয় পুরুষ শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্রীধরের পিতা ১২৫ বছর জীবিত ছিলেন। এও এক ইতিহাস।

কন্যার পরে এক পুত্র। নাম, জগন্মোহন। এইবার তৃতীয় পুত্র। তাঁর নাম রামমোহন। কবে পৃথিবীতে প্রবেশ করলেন! সাল-তারিখের যাবতীয় মতভেদ। কোনো গবেষক বলছেন ১৭৭৪। কোনো গবেষকের অনুসন্ধানে ১৭৮০। আর এক সিদ্ধান্তে সাল এবং তারিখ দুটোই পাওয়া গেল, ১৭৭২ সালের ২২ মে। জননীর কোলে শিশুসন্তান। ওই যে বীজের উপমা! কেউ জানে না। মায়ের কোলে ওটি কে? এইটুকুই জানে, অতি আদরের, অতি সুশ্রী একটি শিশু।

প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে যেমন আলোচনা হয়, বল তো, একে ঠিক কার মতো দেখতে হয়েছে?

মায়ের মতো। মা সুন্দরী, ছেলেও সুন্দর। ছেলেরা মায়ের মুখের আদল পেলে জীবনে সফল হয়, সুখী হয়, নামী হয়।

ছেলে হাঁটতে শিখল, কথা কইতে শিখল। শিশুর বিকাশ হচ্ছে। ফুলের মতো কৈশোর ক্রমশই খুলছে। কনিষ্ঠ সন্তান, তাই পিতা-মাতার অতি আদরের। ছেলেটি শুধু সুন্দর নয়, অসাধারণ তার বুদ্ধি, অদ্ভুত তার স্মৃতিশক্তি। অন্যান্য সমবয়সী ও তাদের পিতামাতাদের বড় ঈর্ষা, এত বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ছেলেটি কোথা থেকে পেল! একবার যা শোনে তা ভোলে না কেন! দুবার করে কোনো কিছু শিখতে হয়নি। একবারেই গেঁথে যায় মনে।

শিশুটিকে নিয়ে ফুলঠাকুরাণী চাতরায় বাপের বাড়িতে এসেছেন। পণ্ডিত দাদুর সঙ্গে নাতির খুব দহরম-মহরম। উৎসব এসেছে। খুব ঘটা করে পুজো করলেন দাদু শ্যাম ভট্টাচার্য। কালীপূজা। দাদু মায়ের পা থেকে একটি বেলপাতা তুলে নিয়ে কল্যাণ কামরায় ঠেকিয়ে হাতে দিলেন। শিশু রামমোহন সেটি মুখে পুরে চিবোচ্ছে।

ফুলঠাকুরাণী দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। বৈষ্ণবের মুখে শাক্তের বেলপাতা। আঙুল দিয়ে মুখ থেকে টেনে টেনে বের করছেন, আর বাবাকে বকছেন।

বের করে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, মুখে জল দিয়ে কুলকুচো করিয়ে দিলেন।

মেয়ের কাণ্ড দেখে প্রবীণ পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পূজার আসনে বসেই অভিসম্পাত দিলেন, 'তুই অহঙ্কার করে আমার পুজোর বেলপাতা ফেলে দিলি! এই ছেলেকে নিয়ে তুই কোনোদিন সুখী হতে পারবি না। এই ছেলে তোর বিধর্মী হবে।'

ফুলঠাকুরাণী চমকে উঠলেন। পূজার আসনে বসে অভিশাপ। বাবার পায়ে ধরে কাঁদছেন আর বলছেন, 'এ তুমি কী করলে? আমি ক্ষমা চাইছি, তুমি শাপ ফিরিয়ে নাও।'

'তা আর হয় না রে! আমার কথা অব্যর্থ; তবে তোর পুত্র রাজপূজ্য অসাধারণ এক মানুষ হবে।'

রামমোহন রায় কোন ভারতে এলেন! আকাশটা তখন কেমন! শিশুর বোঝার উপায় নেই। সে বোধ তখনও হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে জানা যাবে।

'রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল।'

নাদির দিল্লির বাদশাহিকে 'ঘড়া-কাত' করে দিয়ে গেছেন। মারাঠা শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ভারতের দৃষ্টি সেই দিকে। হিন্দুসাম্রাজ্য কি তাহলে তৈরি হতে চলেছে! পেশোয়া বালাজী বাজীরাও কি উদিত সূর্য!

না, ভারতের ভাগ্য অন্যরকম হতে চলেছে।

মোগলদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণভারতে প্রবল হলেন হায়দরাবাদের নিজাম। উত্তর ভারতে অযোধ্যার নবাব। আর বাংলার নবাব তো প্রায় স্বাধীন। মধ্যযুগের শেষ শিখা। সব আশা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পানিপথের যুদ্ধে। তৃতীয় যুদ্ধ। ১৭৫৭ পলাশী। ইংরেজ ঢুকে পড়েছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায়। পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদে ভগ্নহৃদয় পেশোয়া বালাজী বাজীরাও মারা গেলেন। তাঁর সতেরো বছরের ছেলে মাধব রাও হলেন পেশোয়া। মারাঠাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনছিলেন, এমন সময় তাঁর মৃত্যু হল। ১৭৭২ সাল। আর এই বছরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করলেন। আর এই বছরই ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। ১৭৭০ সালে এলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ-যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে কুখ্যাত। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেল।

দাদু বলেছিলেন, 'তোর এই ছেলে বিধর্মী হবে।' কই তার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। মায়ের কোলে বসে গৃহদেবতা গোপীনাথের পূজা দেখেন। কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। পালাগানে কৃষ্ণলীলা শুনতে শুনতে চোখের জল সামলাতে পারেন না। বাল্যকাল থেকেই সাধুসঙ্গে আকর্ষণ। সমবয়সীদের বলতেন, বড় হয়ে আমি সাধু হয়ে বেরিয়ে যাব। হিন্দুধর্মে গভীর নিষ্ঠা। জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে হিন্দুধর্মের বিধান অনুসারে হোমাগ্নিতে বাইশবার পুরশ্চরণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের কিছু কিছু ব্যাপার তাঁকে কষ্ট দিত। পিতা পিতামহ ও মাতামহের পরিবারের সঙ্গে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান নিয়ে যখন বিরোধ বাধত তখন দুঃখ পেতেন।

পাঠ শুরু হল পাঠশালায়। সেই সময় তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী আর মৌলবাদীদের মক্তব। ফারসি আর আরবি শিক্ষালয়।

পাঠশালায় চলল এক ধরনের শিক্ষা আর বাড়িতে ফারসি পড়াতে আসতেন এক মৌলবী। নবাবী আমলে ফারসির খুব কদর। রাজ সরকারে ফারসি না জানলে ঠাঁই পাওয়া যাবে না।

সেকালের পাঠশালার ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনীষীদের স্মৃতিচারণা থেকে উদ্ধার করা যায়। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন, 'গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তালপাতে ; তারপর পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত কলার পাতে ; তারপর কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে ও 'গুরুদক্ষিণা ও 'দাতা কর্ণ' নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরুমহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন।'

ফারসি যাঁরা পড়াতেন রাজনারায়ণ তাঁদের কথাও বলেছেন, এঁদের বলা হত 'আখন্‌জী'। 'আখনজী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন! মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেদরা নিয়ত বশবর্তী। চাকর দ্বারা জল আনয়ন কার্য করিয়া লওয়া আখনজীর মনঃপুত হইত না। তাঁহার সাগরেদ্‌দিগকে কলসী

লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় ধুম। তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পন্দনামা, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক সাধারণ পাঠ্যপুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন।'

সেকালের অদ্ভুত হিন্দু-বিধানে, ৮ থেকে ৯ বছর বয়সের মধ্যে তাঁকে দুবার নয় তিনবার বিবাহ করতে হয়েছিল। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ। দ্বিতীয় স্ত্রীর পরেই তৃতীয়। ১৭৮০ থেকে ১৭৮১, তাঁর জীবনের বিবাহ-বর্ষ। এটি তাঁর ভাল লাগেনি। মনে লিখে রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আপাতত শিক্ষা।

প্রথমা স্ত্রীর ইতিহাস নেই। সেই বালিকা রামমোহনের জীবনে শিশিরবিন্দুর মতো। দ্বিতীয়া স্ত্রীর বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কুড়মন পলাশি গ্রাম। তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী উমাদেবীর পিত্রালয় ছিল ভবানীপুরে। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দিদি।

বাঙলার ফারসী শিক্ষার বেহাল অবস্থা দেখে পিতা রামকান্ত রামমোহনকে পাটনায় পাঠালেন। ফারসী তো শিখবেই আরবিটাও ভাল করে শিখে আসবে। ন'বছরের বালক পাটনায় বসে ইউক্লিড ও আরিস্টটলের অনুবাদ পড়লেন। মৌলবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে আরবি ভাষায় কোরান পাঠ শিখলেন।

পাটনার শিক্ষা রামমোহনের জীবনের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিভূমি রচনা করে দিল। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রভাবে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হল আরও। আরিস্টটলের প্রভাবে তিনি হয়ে উঠলেন যুক্তিবাদী। বিশ্বাস নয় প্রমাণ। সত্যের অনুসন্ধান। কাল্পনিক সত্য নয়। অন্যের অভিজ্ঞতা নয়। আমি জানব, বুঝব, বিশ্বাস করব। তার আগে নয়। গণিতের অভ্রান্ত সত্য। আরিস্টটলের অঙ্ক সব 'ক' যদি 'খ' হয়, আর 'গ' যদি 'ক' হয় তাহলে 'গ' একটি 'খ'। এটি সত্য সে 'ক' যাই হোক না কেন!

মৌলবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে 'একেশ্বরবাদের' প্রভাব পড়ল মনে। ঈশ্বর মুড়ি মুড়কির মতো অনেক হতে যাবেন কেন! এক থেকেই বহু। বস্তু অনেক উপাদান এক। সেই 'এক'-ই সত্য। এই 'এক'-ই ব্রহ্ম।

এর ওপরে পড়ল সুফীদের প্রভাব। হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী তাব্রিজ। সুফীদের মত, বেদান্ত আর প্লেটো প্রায় এক।

পিতা রামকান্ত রায় ধার্মিক তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে বিদ্যোৎসাহী। পাটনার পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর পুত্র রামমোহনকে পাঠিয়ে দিলেন কাশী সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে। রামমোহনের বয়স তখন মাত্র বারো।

শিক্ষা ও ধর্মের মহা পীঠস্থান কাশী। শৈব তীর্থ। ইতিহাসের সাক্ষী। বারো বছরের বালক রামমোহন অবাক হয়ে দেখেন, নদী, নালা, বন, জঙ্গলের বাংলা একরকম, পাথরের বারাণসী আর এক রকম। পাথরের বাড়ি, পাথরের ঘাট, পাথরের মন্দির। যেমন গরম, তেমন শীত। একমুখী গঙ্গা। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দুর সহ-অবস্থান। পণ্ডিত আর পালোয়ান পাশাপাশি। আঁকা-বাঁকা বিধবা-গলি। বাঙালি টোলা। ওদিকে বাইজিদের মহল্লা, ডাল-কা-মণ্ডি। বাঙালি বিধবাদের কায়ক্লেশ। ঘটি হাতে গঙ্গার তীরে পরপারের প্রতীক্ষা। দানসত্রের কৃপায় দেহধারণ। অন্যদিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্রহ্ম অন্বেষণ। অন্যদিকে পূজার বাহ্য আড়ম্বর।

এক মণ্ডলী মেধার সাহায্যে, যুক্তি ও চর্চার সাহায্যে জগৎকারণের সন্ধান করছেন। তাঁরা বিজ্ঞানী। মেধাই তাঁদের পরীক্ষাগার। দর্শনই তাঁদের যন্ত্র। জড়বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তফাত এই, জড়বিজ্ঞানী ফল দেখে সিদ্ধান্তে আসবেন, পরাবিজ্ঞানীরা ফল আর সিদ্ধান্তের উৎসভূমিতে পৌঁছে রঙ্গশালার নায়ককে দেখবেন। রূপ না থাকলে অরূপ আছেন। শক্তিমান না থাকলেও শক্তি আছে।

তখনও বালক, কিন্তু মেধায় বয়স্ক। ক্ষুরধার বুদ্ধি, অভাবনীয় স্মৃতি ও মেধা। জিজ্ঞাসু রামমোহন বান্ধবহীন বিদেশে, কাশীর মহল্লায়, মহল্লায় পাঠের অবসরে ঘুরে বেড়ান। বাংলা থেকে কাশী যাওয়া তখন সহজ ছিল না। রেল-পথ হয়নি। জল পথ, না হয় হাঁটাপথ।

মনিকর্ণিকার শ্মশানে সারি সারি চিতা জ্বলছে। অনির্বাণ শ্মশান। বাল বিধবাদের দেহ। কঙ্কালসার। ধর্মে সমর্পণ করলে ত্বরায় চিতারোহণ। ব্যবসায়ীর হাতে সমর্পণ করলে দেহ হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু ধর্মনাশ। বঙ্গললনার এ কি নিয়তি। তুর্কীর হারেমে, পর্তুগিজদের দাস ব্যবসার শৃঙ্খলে, আরাকানদের চালানে মগের মুল্লুকে। আর ধর্ম ধরে থাকলে শাস্ত্রের শাসন। বৃদ্ধ কুলীনের শতস্ত্রী। বাল্যবিবাহ, বাল্যে বিধবা। নির্জলা একাদশী। একবেলা আহার। ভাইয়ের সংসারে দাসীবৃত্তি। এই কাশীতে বসেই বালক রামমোহন প্রতিজ্ঞা করলেন, হিন্দুধর্মের ভেতরে বসেই যুগসঞ্চিত তেলকালিঝুল মার্জনা করবেন। চামচিকি তাড়াবেন। সংহিতার আবরণ সরিয়ে বেদের আলোকে পুনরুজ্জ্বল করবেন। কাশী তখন শ্রুতি, স্মৃতি,

ন্যায় শিক্ষার পীঠস্থান। ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের বসবাস সেই শিবক্ষেত্রে। রামমোহন তাঁর মেধা বলে অতি অল্প সময়ে আর্থশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেললেন। শুধু আয়ত্ত নয়, কণ্ঠস্থ। একবার যা শুনতেন তা ভুলতেন না কোনোদিন।

কোরান ও সুফী, গণিত ও পাশ্চাত্যে দর্শন, আরিস্টটল ও প্লেটোর যুক্তিবাদ, চোখের সামনে দেখা হিন্দুধর্মের বিচিত্র ভণ্ডামি, বিভিন্ন বিশিষ্ট ধর্মের উত্তরসাধকদের ভ্রষ্টাচার, তন্ত্রের নামে ব্যভিচার, সমস্ত কিছু একত্রিত হয়ে রামমোহনের ব্যক্তিত্বকে একটি শিলাখণ্ডের মতো কঠিন করে তুলল। দুর্ভেদ্য এক দুর্গ। সেই শিলার আবরণে উজ্জ্বল এক আলো। শিক্ষিত মনের উদার অন্বেষণ। শুধু ধর্ম নয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত মানব কল্যাণের ধর্ম।

প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক আস্থা ছিল। ভক্তি ছিল অপরিসীম। প্রকৃত বৈষ্ণব। নিষ্ঠাবান। ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করে জলগ্রহণ করতেন না। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে বাড়িতে 'মানভঞ্জন' পালা হতে দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণ ধরে কাঁদবেন। তাঁর শিখিপুচ্ছ আর পীতধড়া ধুলোয় লুটোবে এ তাঁর চক্ষুশূল।

বয়েস সবে চোদ্দ। রামমোহন সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। মাতা ফুলঠাকুরানীর কাতর মিনতি, সে কি বাবা! আমি কি নিয়ে থাকব? তোমার দুই স্ত্রী। তারা?

রামমোহন স্থির হলেন ; কিন্তু প্রকৃত ধর্মকে যতই বুঝছেন প্রচলিত ধর্ম থেকে তাঁর ব্যবধান ততই বাড়ছে। সে ব্যবধান পিতার মত ও দর্শনের সঙ্গে। পিতা দুঃখিত, বিরক্ত। একদিন বলেই ফেললেন, 'আমি আমার মতের সপক্ষে যে কোন যুক্তি বলি, তুমি প্রথমে একটা 'কিন্তু' বলে তার উত্তর আরম্ভ করো। কেন? এত 'কিন্তু' কিসের!'

এই সময় রামমোহন, ষোল বছরের যুবক, একটি বই লিখে ফেললেন, 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী।' সমাজের ভয়, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভয়, তাঁদের তৈরি সমস্ত বিধি-বিধানের ভয় অগ্রাহ্য করে তিনি নিজের মত প্রকাশ করলেন, ঈশ্বর অপরিতি, অতীন্দ্রীয়। তাঁর প্রতিমূর্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না। এর কারণ, তিনি যেমন তাঁর প্রতিমূর্তিও সেই রকম হওয়া উচিত। তা হচ্ছে কই, বিপরীতটাই হচ্ছে। সমস্ত প্রতিমূর্তিই উপাসক মানুষের সম্পূর্ণ অধীন। ব্রহ্মাকে সর্বময় জানলে বিশেষ রূপে তাঁর পূজার

প্রয়োজন হত না। ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন, কোন স্থানে অল্প এ একেবারে অসম্ভব। পিতা রামকান্ত পুত্র রামমোহনকে বললেন, 'দেখো, তোমাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না।' তেজস্বী রামমোহন গৃহত্যাগ করলেন। সন্ন্যাসীর বীজ তো তাঁর ভেতরেই রয়েছে। মায়ের করুণ মিনতিতেই তো বেরনো যাচ্ছিল না। দুই স্ত্রী, দুটি বালিকা। স্বামী, সংসার বোঝার মতো বয়েস তাদের হয়নি। কুলপ্রথারক্ষার জন্যই তোমরা দুটি বালিকার মুক্তজীবন নষ্ট করেছ। রামমোহনের ভেতর যে-সংসার আছে, তার নাম জগৎ সংসার।

এই তো সুযোগ! সারা ভারতটাকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। কে কোথায় কেমন ভাবে আছে! কী ভাবে আছে! অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, দুর্নীতি সব দেখা যাক। বিরাট একটা আকাশ ভেতরে খুলছে। নতুন একটা আলো ফুটছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর ভ্রমণ শুরু হল। অকারণ ভ্রমণ নয়, শিক্ষা ভ্রমণ। সেই প্রদেশের সাধারণ মানুষের আচার, আচরণ, ধর্ম এবং ভাষা জানা এবং শেখা। ভাষা না জানলে একটি দেশের কিছুই তেমন জানা যায় না।

এক একটি প্রদেশে যাচ্ছেন আর সেই প্রদেশের ভাষা অল্প সময়ের মধ্যেই শিখে ফেলছেন। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নানক, কবির, দাদু মূল ভাষায় পাঠ করলেন। পরবর্তীকালে ইচ্ছামতো তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন।

ভারতে তখন অন্ধকার যুগ চলেছে। মুসলিম শাসকরা ছিলেন যুদ্ধ ব্যবসায়ী। যত দিন বাঁচবো যুদ্ধ করব। হয় মারব না হয় মরব। অখণ্ড ভারত, সুশাসন, জনকল্যাণ, শিক্ষার প্রসার, শিল্প-সংস্কৃতি, এ সব তাঁদের ছিল না, জানার কথাও নয়। ইতিমধ্যে ইংরেজ ঢুকছে। পশ্চিমের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধরনধারণ ভাষা, সাহিত্য আসবে অনেক পরে।

রামমোহন যখন ভারতভ্রমণ করছেন তখন দেশে সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একটা দেশ স্রেফ পড়ে আছে ঘোড়ার ক্ষুরের তলায়। পথ-ঘাটের কথা ভাববে কে? যারা ভাঙতে এসেছে, লুঠতে এসেছে তারা গড়বে কেন। গোটা দেশ দস্যু তস্করে ভরা। রাত নামলে মানুষ ভয়ে মরে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় প্রাণ হাতে করে যাওয়া। এই অবস্থায় ষোল বছরের দুঃসাহসী যুবক হিমাচল পেরিয়ে তিব্বতে চলে গেলেন।

একটানা সাতশো বছর দাসজীবন যাপনের ফলে পরাধীনতা মজ্জায় ঢুকে

গেছে। কুসংস্কার ভরা কদাকার জীবন। খাবার জোটে না, গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা। বেঁচে থাকলে বেঁচে-থাকা, মরে গেলে বেঁচে যাওয়া। সেই সময়ে রামমোহন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ঘৃণায়। পরাধীন দেশে থেকে কী হবে! আর একটি কারণ, সব ধর্মই প্রায় জানা হল, একটি ধর্মই বাকি — বৌদ্ধ ধর্ম।

সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রামমোহন তিব্বতে প্রবেশ করলেন। ষোড়শবর্ষীয় রামমোহন কোন পথ নিলেন? যে-পথে স্বামী অখণ্ডানন্দজী পরবর্তীকালে গিয়েছিলেন। হিমাচল থেকে তিব্বত আর কোন পথে যাওয়া যেতে পারে।

বদরীনারায়ণে বদরীবিশালকে দর্শন। চলো কেদার। সেখান থেকে গৌরীকুণ্ড। নালাচটি হয়ে মন্দাকিনী পার। ওখিমঠ। বিশ্রাম। আবার যাত্রা। তুঙ্গনাথ। গোপেশ্বর। একপাশে অলকানন্দা। নীল প্রবাহ। তীর ধরে এগিয়ে চলা।

দুটি 'পাস'। একটি 'মানা'। আর একটি 'নিতি'। 'মানাপাস' অতি দুর্গম। জোশীমঠ থেকে 'নিতিপাস' দিয়েই সাধু-সন্তরা তিব্বতে যান। যেদিক দিয়েই যাওয়া হোক, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই। বিশ্রী আবহাওয়া, প্রবল শীত। আবার বর্ষা না এলে বরফ গলে পথ খুলবে না। সবই বরফ। পথ উঠছে। ক্রমশই ওপরে। আরো ওপরে। বারো হাজার, তেরো, চোদ্দ, সতের হাজার ফিট।

ইতিহাসের আগেও তো ইতিহাস আছে, যার নাম পুরাণ। মানুষ নেই। আছে প্রকৃতির খেয়াল খেলা। বিশাল একটি হ্রদের তলায় অবগাহনে ছিল এই উপত্যকা। এমন সময় পরম দয়ালু বোধিসত্ত্ব এসে দাঁড়ালেন হ্রদের ধারে। বহু জন্ম পরে তাঁকেই তো আসতে হবে বুদ্ধ অবতারে। করুণাময় বোধিসত্ত্ব এই হ্রদকে মুক্ত করে প্রবাহিত করলেন একটি নদী হিমালয়ের ভেতর দিয়ে। নদীটির নাম 'শাংপো'। জেগে উঠল তিব্বতের মালভূমি।

ভূতাত্ত্বিকরাই বা বসে থাকবেন কেন? তাঁদের প্রমাণ নির্ভর সিদ্ধান্ত কল্পনার অনুগামী। কুড়িয়ে পাওয়া অতীতের টুকরো জোড়া লাগিয়ে ভূতাত্ত্বিক রহস্যভেদ। দুটি ভূভাগ এগিয়ে আসছে মাঝে সমুদ্র। সেই সমুদ্রের নাম যদি 'টেথিস'। উত্তর আর দক্ষিণ। পূর্ব আর পশ্চিম পরে। আগে উত্তর আর দক্ষিণ ভূখণ্ডের মিলন ঘটুক ধীরে ধীরে, যুগযুগ ধরে। মানুষ আসার বহু বহু আগে। সেই চাপে প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রটি আর রইল না। লম্বা লম্বা ভাঁজে তৈরি করে বসল বিশাল বিপুল পর্বতমালা। যে সাগরের নাম ভারত মহাসাগর, সেই সাগর পাঠাতে লাগল মৌসুমী বাতাস আর বারি। পাহাড় চূড়ার মাটি নামতে লাগল।

ভাঁজ ভরাট হতে হতে তৈরি হল পৃথিবীর অতি গোপন, দুর্গম, নিভৃত এক ভূভাগ—'চ্যাং ট্যাং'। আমাদের তিব্বত। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ষোল হাজার ফুট — 'রুফ অফ দি ওয়ারলড'।

আর্যরা পাঞ্জাবের পথে প্রবেশ করে সেই অসাধারণ, ভয়ংকর সুন্দর ভূভাগের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। কার এই সৃষ্টি! সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত বিরাটের বিচিত্র রূপ। একের পর এক, শেষ নেই। শুধু বরফে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ। প্রথম সূর্যের আলোয় কাঁচা সোনার রঙে স্থির হয়ে আছে। স্রষ্টা তাঁর যাদুদণ্ডটি ঘুরিয়ে বললেন, তরল সমুদ্র তুমি স্থির হও। অচঞ্চল ঢেউ। একের এক এক। সংখ্যা করা যায় না। বিরাট যে কত বিরাট! শুভ্রবর্ণের বিশিষ্ট একদল মানুষ, যাঁরা পশ্চিম-পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন প্রকৃতির এই নিভৃত কারুশালায়, তাঁরা স্তম্ভিত। এই তো সেই স্বর্ণ স্বর্গ, দেবতার জন্মভূমি। এঁরাই হলেন ঋষি। 'বেদ' এলেন এঁদেরই কাছে।

তুষারের ঢেউ। হিমবাহের গর্জন। জলধারার অবিরল প্রপাত। কত আকার, আকৃতির মেঘপুঞ্জ, কত রং, কত রকমের আলো! এই তো সেই ভগবানের সাম্রাজ্য! হিমবন্ত, হিমাচল, হিমালয়। তাঁদের ধ্যান আর অবলোকন থেকে বেরিয়ে এল সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব। 'কসমোগ্রাফ।'

ওই যে জ্যোতির্ময় পর্বতটি সবার আগে দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে, শিব স্বরূপ, ওই তো বিশ্বের মেরু। এই পৃথিবীর নাভিমণ্ডল। প্রভাত সূর্যের মতো উজ্জ্বল, ধূমহীন অগ্নিমণ্ডল। 'স্কন্দ পুরাণ' বললেন—প্রভাত সূর্য উদিত হলে শিশিরের যেমন চিহ্ন থাকে না, সেই রকম হিমালয়ের দর্শন মানুষের সব পাপ মুছে যায়। এ যে 'শিব নিবাস'। বিষ্ণুর পদযুগল হতে পদ্ম-নালীকের মতো নেমে আসছে গঙ্গা। এইখানেই কৈলাস, মানসসরোবর।

ওই মেরুচূড়ায় দেব-বিরাজিত স্বর্গ। ইন্দ্রলোক। দেবগণ-সহ ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। তারার আলোর পথ ধরে, বিচিত্র বৃক্ষ ও পুষ্পের গন্ধে আমোদিত হতে হতে যাত্রী চলো স্বর্গে। মৃত মানবের আত্মা সেখানে অপেক্ষা করে আছে পুনর্জন্মের। দেবাত্মা, পরমাত্মার মিলিত মিশ্রিত অবস্থানে জীবাত্মার আসা-যাওয়া।

কৈলাস, মানস পাশ কাটিয়ে রামমোহন চলেছেন তিব্বতে। অভিযাত্রী বিদেশিদের চোখেই প্রথমে পড়েছিল এই অলৌকিক অঞ্চলটি। নিভৃত, গুপ্ত, ভয়ংকর একটি স্থান। হিমালয়ের মেরু পর্বতের আসনে বসা স্রষ্টা তৈরি করেছিলেন পৃথিবীর ব্লু-প্রিন্ট। এই রকমই মনে হয়েছিল। এত দুর্গম, অথচ

কি সুন্দর! মানুষ মেধা আর প্রযুক্তি বলে বহু কিছু রচনা করতে পারে, আরো পারবে; কিন্তু পৃথিবী এই নাভিটির 'কপি' তৈরি করতে পারবে কি?

আরঙ্গজীব আকবরের তক্তে বসে ভারতের কি কল্যাণ করেছিলেন ইতিহাস জানে। লেখা আছে কালের পথিকের জন্যে। কিন্তু আকবর! আকবর দি গ্রেট! তিনি দরবারে ডেকে পাঠালেন বিশিষ্ট কয়েকজনকে, যাঁরা বোদ্ধা এবং সাহসী। তিনি বললেন, ভারতীয় হিন্দু ঋষিরা বলেন, পবিত্র গঙ্গা হিমালয়ের সু-উচ্চ শিখর থেকে নামছে। যে-স্থান থেকে ধারাটি বেরোচ্ছে তার আকৃতি না কি গরুর মুখের মতো। হয় তাঁদের কেউ সেই দুর্গমে গিয়ে দেখেছেন। না হয় ধ্যানে জেনেছেন। তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি উৎস-সন্ধানে একটি অভিযাত্রী দল পাঠাতে চাই। আপনারা দেখে এসে জানান, গোমুখী সত্যই গঙ্গার উৎস কি না? এই অভিযানে যে মানচিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছিল সেটি পরবর্তীকালে ছাপা হল স্যামুয়েল পুরচাসের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনীতে। বইটির নাম 'পুরচাস হিজ পিলগ্রিমেস'। ১৬২৫ সালে প্রকাশিত। অভিযাত্রীরা দেখে এলেন ঋষিদের কথাই ঠিক। গোমুখাকৃতি কন্দর থেকে উৎসারিত হচ্ছে অবিরল জলধারা। হুহু করে বেরিয়ে আসছেন মা গঙ্গা।

আকবরের এইবার জানার ইচ্ছা হল খ্রিস্টধর্মের তত্ত্ব। রাজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন গোয়ায় গড়ে ওঠা পর্তুগিজ বাণিজ্যকেন্দ্রের জেসুইট মিশনারিদের। রমতা সাধুদের কাছ থেকে শোনা একটি খবরে মিশনারিরা ভীষণ উত্তেজিত। সম্রাটকে তাঁরা সেটি জানালেন। হিমালয় প্রত্যাগত সাধু আর যোগীরা দেখে আসেছেন, হিমালয়ের পারে এক আশ্চর্য সাধককে, যাঁর সাধন ভজন ক্যাথলিক পন্থী খ্রিস্টানদের মতো। তিনি একাই যেন একটি গির্জা।

আবার অনুসন্ধান। হিমালয়ের পারে কোন সে দেশ? তিব্বত। হারানো একটি খ্রিস্টান সভ্যতার ইতি-বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হল। যে-সভ্যতা বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। রূপকথার সেই সাম্রাজ্য 'কিংডাম অফ প্রেস্টার জন।'

১৯০৬ সালে, কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে হঠাৎ একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হল। যেটি লেখা হয়েছে তিনশো বছরেরও আগে। লেখক একজন জেসুইট পাদ্রি। নাম, আন্তোনিও দ্য মনসারেট। ইনি আকবরের দরবারে আড়াই বছর ছিলেন। সম্রাটের এক পুত্রের শিক্ষক হিসাবে। এরপর তিনি বদলি হলেন আবিসিনিয়ায়। সেখানে তাঁর ছটি বছর কাটে কারারুদ্ধ অবস্থায়। এই ছ'বছরে তিনি একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত লেখেন। সেই পাণ্ডুলিপি অদ্ভুতভাবে চলে এল

সেন্টপলসের 'জেসুইট পেপারস কালেকসানে'। এখনও সেটি আছে। অনুবাদ হয়নি, প্রকাশিতও হয়নি। রক্ষিত আছে পুঁথির আকারে। লাতিন ওই লিপিতে প্রথম একজন ইউরোপীয় মানস সরোবরের কথা বললেন। 'ইনকোলিস মনেসরুঅর'। তিনি লিখছেন, ভারতীয় যোগীরা বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন। সত্য-মিথ্যা অনেক কথা বলেন। বহু সময় বাস্তবের সঙ্গে উপকথা মিশিয়ে ফেলেন। তবু যদি এই ভ্রাম্যমাণ যোগীদের কথা বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তাঁরা মানসসরোবরে এখনো জীবিত কয়েকজন খ্রিস্টানকে দেখে এসেছেন। স্থানটি তাঁদের বর্ণনায়—বিশাল খাড়া খাড়া পাহাড়। আরোহণ অতি দুঃসাধ্য। কোনোরকমে একবার উঠতে পারলে পাওয়া যাবে অপূর্ব এক উপত্যকা, যেখানে মানুষের বসবাস সম্ভব। সেখানে সুন্দর একটি সরোবর আছে, যার নাম 'মানসসরোবর'। এল যেন মুক্তোর দানা। সেখানে আমরা একটি প্রাচীন নগর দেখেছি। দেখছি একদল উপজাতি।' পাণ্ডুলিপিতে আটকান আছে ছোট্ট একটি স্কেচম্যাপ। বিশাল এক পর্বত বলয়ের নাম 'ইমায়ুস।' সেই পর্বতমালার ওপারে আঁকা রয়েছে গোল একটি বৃত্ত। আর সেই বৃত্তটিকে বড় বড় অক্ষরে চিহ্নিত করা হয়েছে 'MANSARVORLUCUS' তারই পাশে ছোট্ট ছোট্ট করে লেখা, Hicdicunter Christianihabitare'। যার অর্থ, জানা গেছে এক সময় খ্রিস্টানরা এখানে বসবাস করত।

দুর্গম শিখরচূড়ায় খ্রিস্টান উপনিবেশ! মানস নয় ওই উপনিবেশটিকে চাক্ষুষ করা। জেসুইটদের মহা-আগ্রহ। ১৬০৩ সাল। একদল অভিযাত্রী আগ্রা থেকে বেরলেন। দলের নেতা, বেনেডিক্ট দা গোস। ব্যর্থ অভিযান। তিমি দেশটাই খুঁজে পেলেন না। ভুল পথে এগিয়ে পর্বত আরোহণের ক্লান্তিতে চীন সীমান্তে তাঁর মৃত্যু হল।

সফল ইওরোপীয় অভিযানের নেতা, ফাদার আন্তোনিও দা আন্দ্রেদ। শক্তপোক্ত, সংগ্রামী। বয়েস মাত্র চুয়াল্লিশ। সহকারী হলেন মারুয়েস। তিনি পাদ্রি নন। সঙ্গে আরো কয়েকজনের একটি দল।

১৬২৪, বসন্তকাল। মোগল দরবার থেকে যাত্রা শুরু। দিল্লি থেকে তাঁরা তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে বেরলেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীর বিরাট এক দলে মিশে গেলেন। বদরীনাথের যাত্রী। ছদ্মবেশীরাও সুরে সুর মেলালেন, জয় বাবা বদ্রীনাথ। জয় জয় বদরীবিশাল।

প্রথমেই হরিদ্বার। গঙ্গার প্রবেশ পথ। আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে

বিস্ময়কর পর্বতমালা শিবালিক শিবভূমি। যাত্রীদল এগোচ্ছে। অলকানন্দার তীর ধরে। শ্রীনগরের রাজার এলাকা। বৈষ্ণবতীর্থ বদরীনাথ। আন্দ্রেদ ও তাঁর লোকজন মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। ধরলেন তিব্বতের পথ। তাঁদের এই দলছুট হওয়া শ্রীনগরে রাজকর্মচারীদের নজর এড়াল না। অভিযানের মূল আরোহণ-পর্বে তাঁরা পথ আটকে দাঁড়ালেন। ফিরে যাও বদরীনাথে।

ফিরে এলেন। দুঃসাহসী আন্দ্রেদ সহজে পরাস্ত হওয়ার চরিত্র মন। তিনি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে একটা ঝুঁকি নিলেন। সঙ্গে মানা থেকে এক ভুটিয়াকে নিলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে। রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে এগিয়ে চললেন তিব্বতের পথে।

প্রথম লক্ষ 'মানা পাস'। বছরের শুরু। প্রকৃতি তখনো তিব্বতের পথ খুলে দেননি। বীভৎস আবহাওয়া। তাঁরা অনেক আগে এসে পড়েছেন। সব পুরু বরফে ঢাকা। প্রবল তুষার ঝঞ্ঝা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধের অবস্থা। যেন কোথাও কিচ্ছু নেই। সব সাদা। অদ্ভুত একটা জ্যোতিতে চার পাশ ঝলসে যাচ্ছে। এই আলোয় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। 'গ্লেয়ার'। সতের হাজার ফুট উচ্চতায় শ্বাসকষ্ট। এক পা হাঁটার চেষ্টা করলেই দমবন্ধ হয়ে আসছে। অ্যালটিটিউড সিকনেস। এই অবস্থার স্বাস্থ্যবানও নিমেষে অসুস্থ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। ভুটিয়া গাইড বললেন, মানুষ এখানে মারা যায় বিষাক্ত বায়ুর জন্যে। এক ধরনের বিষাক্ত বাষ্প বাতাসে মিশে থাকে। আন্দ্রেদ তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, 'কথাটা ঠিক। এই যাকে দেখলাম তার তাজা, কয়েক পা হাঁটার পরই কি হল কাঁপতে কাঁপতে পড়ল ধড়ফড় করে মারা গেল মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। তবে নিজেদের কষ্ট দেখে মনে হচ্ছে বিষাক্ত বায়ু নয়, প্রচণ্ড শীত আর খাদ্যে মাংসর অভাবই কারণ।'

পর্বত আরোহণের লিখিত ইতিহাসে ফাদার আন্দ্রেদের এই অভিযানই প্রথম 'হিমালয় অভিযান।' প্রথম বলেই বোধ হয় প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর সঙ্গে এমন পাঞ্জার লড়াই। যে সময় তিনি এবং তাঁর ভুটিয়া সঙ্গী সতের হাজার নশো ফুট উচ্চতায় মানাপাসের মুখে এসে দাঁড়ালেন শুরু হল সাংঘাতিক তুষার ঝঞ্ঝা। হাড়কাঁপানো বাতাস। এ-পাশে ও-পাশে দুটি পাহাড় মাঝখানে একটি সংযোগ পথ। পর্বত আরোহণের ভাষায় 'স্যাডল অফ দি পাস'। আন্দ্রেদ লিখছেন, 'ঠাণ্ডায় আমাদের পা দুটো জমে গেছে। ফুলে উঠেছে। কোনো সাড় নেই।' এক টুকরো গরম লাল লোহা পায়ের ওপর রাখা হল। যন্ত্রণার কোন বোধই নেই।'

তবু এগোতে হবে। মৃত্যু হলে হবে। ফেরা চলবে না। লিখছেন, 'সব সাদা। জ্বলজ্বলে সাদা। আমরা তুষার অন্ধ। পথ কোথায়? আমাদের সামনে কোনো পথ আছে কি?' অনুমানের উপর নির্ভর করে এগোচ্ছেন তাঁরা। মৃত্যুকে পিঠ দেখাব না, বুক দিয়ে আলিঙ্গন করব। অবশেষে তাঁরা 'মানা-পাসের' স্যাডল'-এর ওপর এসে দাঁড়ালেন। ওই তো তিব্বত! রহস্যময় সভ্যতা। পাহাড়ের গোপনীয়তায় ঢেকে রেখেছে নিজেকে।

তাঁরা এগোচ্ছেন। লক্ষ্য পর্বতচূড়া। তাঁদের দেহবোধ চলে গেছে। ভগবানের সাম্রাজ্য তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন অলৌকিক এক সরোবর। সেই জলাধার থেকে উপচে পড়ছে দুটি ধারা। দুটি পবিত্র নদী।

আন্দ্রেদ তখনো জানেন না, তিনি কোথায় এসেছেন, কি দেখেছেন! সামনের উপত্যকাটির নাম 'মানা'। হ্রদটির নাম 'মানস'। মানসকে জল পাঠাচ্ছে আর একটি 'হিমবাহ' স্থানীয় মানুষরা যাকে বলে 'দেওতাল'।

প্রবাহিত সরস্বতী বদরীনাথের কিছু ওপরে অলকানন্দাকে আলিঙ্গন করে মুক্ত করবে গঙ্গা। যেখানে এত বরফের সমৃদ্ধি, তুষারের সাম্রাজ্য, সেখান থেকেই তো মুক্ত হবে বড় বড় নদী। জীবের তৃষ্ণা, ভূমির তৃষ্ণা মেটাতে হবে তো! চারটি বড় নদী নেমে আসছে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য, বিরাটের বিপুল খেলা। ইয়াংসি আর হোয়াংহো ঢাল বেয়ে নেমে গেল চীনের দিকে। পূর্বমুখী। সিন্ধু একা একা বইতে লাগল পশ্চিমদিকে। শতদ্রু বললে, একা একা যাও কোথায়! দাঁড়াও, তোমার হাত ধরে আরব সাগরে যাই। সতের হাজার নশো ফুট উচ্চতায় দেবলোকের সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আন্দ্রেদ দেখছেন, বরফের ঢেউ, নরম বরফের হ্রদ, নদীর প্রপাত, সৃষ্টিধ্বংসী সাঁসাঁ বাতাস। উত্তরে, আরো উত্তরে বৃক্ষশূন্য, জনমানব শূন্য, খাঁ খাঁ এক মরুভূমি—টাকলা মাকান। এইসব নাম পরে এল। প্রথমে শুধু দর্শন।

একমাস পরে তুষার কমে এল। পথ যখন অনেকটা নিরাপদ হল। শ্রীনগরের রাজার বিরক্তিকর বিরোধিতা যখন আর রইল না, তখন আন্দ্রেদ আর মারকেস দুজনে একসঙ্গে 'মানা লা' অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করলেন। উচ্চতা থেকে নেমে এলেন নির্জন এক রাজ্যে। ভুতুড়েই বলা চলে। চতুর্দিকে গভীর গভীর গিরিখাত। এমন একটি দেশকেই বলে গিরিদরি যুক্ত ভূভাগ।

প্রাচীন এক পরিত্যক্ত রাজ্য-কিংডাম অফ গুজ। সাত শতাব্দীর গৌরবময় অবস্থানের অতীত স্মৃতি। রাজধানীর নাম 'সাপারাং'। পাশেই বৌদ্ধবিহার

'টোটলিং'। পশ্চিম তিব্বতে ধর্ম ও রাজনীতির সমৃদ্ধ এক কেন্দ্র। সারা তিব্বত ছিল যার নিয়ন্ত্রণে।

আন্দ্রেদ আর মারকিস যখন এলেন, তখন প্রায় শেষ অবস্থা। চিরকাল তো থাকে না কিছুই! ধ্বংসের যে-টুকু বাকি ছিল সেটুকু পরোক্ষে সম্পূর্ণ করে দিলেন এই পাদ্রি ফাদারদ্বয়। নিবু নিবু প্রদীপে তাঁরা শেষ ফুঁটি মেরে দিলেন।

এসেছিলেন খ্রিস্টানের সন্ধানে। সে-রকম কোনো গোষ্ঠীর সন্ধান পেলেন না। পেলেন অসাধারণ এক প্রেমিক মানুষকে। যাঁর আচার-আচরণ, জীবনচর্যা, ধর্ম, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, প্রেম সব খ্রিস্টানের মতোই। এমন কি প্রার্থনামন্ত্র এবং সুরও সেই রকম। লামাদের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। মড়ার মাথার খুলি তাদের পানপাত্র। পায়ের মোটা হাড় দিয়ে ড্রাম বাজায়।

গুগের রাজা-রানীর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন আন্দ্রেদ। ১৬২৫ সালের গ্রীষ্মে শাপারাঙ্গে তৈরি হল গির্জা। রাজার কাছ থেকে শিলমোহর পেলেন, 'আন্দ্রেদ আমাদের প্রধান লামা। রাজ্যের সর্বত্র ঘোরার ও ধর্মপ্রচারের অধিকার তাকে দেওয়া হল। কেউ যেন এই ধর্মপ্রচারককে শারীরিক নির্যাতন না করে। নিরাপত্তা সুরক্ষিত হোক।'

বিদেশী একটি ধর্মের প্রতি রাজা এই অনুরাগে প্রজা বিদ্রোহ হল। লাডাকের রাজার সৈন্য সামন্তের সাহায্যে অবরোধ করা হল শাপারাং। রাজা সিংহাসন হারালেন। বিদ্রোহীদের হাতে তছনছ হল রাজ্য। গির্জা ধ্বংস হল। বন্দী হলেন পাদরিরা। গোয়ায় বিষ দিয়ে মারা হল আন্দ্রেদকে। সহকারী মারকিজ বন্দী ছিলেন তিব্বতে। কোনোরকমে একটি চিঠি পাঠাতে পেরেছিলেন আগ্রায়, আমার ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন চলছে। এর পর তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তরুণ রামমোহন কি তিব্বত থেকে ফিরে আসতে পারতেন। একেবারে সহায়-সম্বলহীন, ওই ভয়ঙ্কর ভূ-প্রকৃতি, উত্তীর্ণ হয়ে তিব্বতে পৌঁছলেন। পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে আটকে থাকা অদ্ভুত এক দেশ। যার আয়তন, চার লক্ষ সত্তর হাজার বর্গমাইল। জনসংখ্যা নেহাত কম নয়। পশুপালন, পশুচারণ আর সামান্য চাষবাস মানুষের জীবিকা। চমরি গাই অদ্ভুত এক জীব। পশুপালকরা যাযাবর।

রামমোহন সুজলাং বাংলার ছেলে। এই ভূমি, ভূমিজ আর আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। গ্রীষ্মে অসহ্য শুষ্ক উত্তাপ, শীতে সেইরকম ঠাণ্ডা।

পশুপালকরা সারাটা বছর ভ্রাম্যমাণ। সঙ্গে চলেছে চামরি গাইয়ের দল, বন্যগাধা, পাল পাল ভেড়া আর ছাগল। দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতের পাহাড়ে সেই হরিণ পাওয়া যায়, পৃথিবী বিখ্যাত কস্তুরী মৃগ।

চাষবাসও চোখে পড়ে। যব, গম, বজরা, মটর। ফলের বাগান আছে, সবজির চাষ আছে। লোহা, সোডা, নুন, পটাশ আর বরোক্সও পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় সম্পদ সোনা। পাহাড় ধোয়া নদীর জলে ভেসে ভেসে আসে। দানা দানা সোনা আটকে থাকে নদীর বালিতে। সেই সোনা যে কেউ বালি ছেঁকে তুলতে পারবে না। ধর্মগুরুদের সম্পত্তি। তাঁদের আদেশ ছাড়া এক কণাও স্পর্শ করার উপায় নেই।

রামমোহনের সংগ্রাম পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। তিব্বতে তিনি এ কি দেখছেন! এখানকার মানুষের এমন বিশ্বাস কোথা থেকে এল। এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা একজন মানুষ এবং তাঁর নাম 'লামা'। 'লামা' নামধারী এই দেব মানবের মৃত্যু নেই। দেহান্তর আছে। লামার মৃত্যুর পর কোথাও না কোথাও একজনকে পাওয়া যাবে, যিনি লামার লক্ষণাক্রান্ত আর একজন 'লামা'। এক শরীর থেকে আর এক শরীরে প্রবেশ।

এ ত 'অবতারবাদ'। পৌত্তলিকতার সঙ্গে লড়াই। গোঁড়া হিন্দু পিতা দূর করে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। মেঘলোক উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন গৌতম বুদ্ধের সন্ধানে তিব্বতে। যে-দেশের মানুষের একমাত্র অবলম্বন ধর্ম। তাদের এ কি বিশ্বাস!

ভয় কাকে বলে জানেন না। প্রশ্নের অধিকার জন্মশত। মানুষ প্রশ্ন করবে, জানাকে যুক্তি দিয়ে হয় গ্রহণ করবে, না হয় খারিজ করবে। প্রতিপদে তিনি প্রতিবাদ করতেন। এ তোমাদের ভয়ংকর এক কুসংস্কার। প্রকৃত ধর্মকে গ্রহণ করো, চর্চা করো। মিথ্যা দিয়ে শাস্ত্র তৈরি করে সত্য থেকে দূরত্ব বাড়িয়ো না।

এ কে? কোথা থেকে এল এই বিধর্মী! একে মেরে ফেলো। সেই পাদরিটার মতো এটাকেও হজম করে ফেল।

নারীর স্নেহ। এই দুর্লভ বস্তুটির কথা তিনি সারাজীবন মনে রেখেছিলেন। পৃথিবীতে বহু মূল্যবান পদার্থ আছে। হীরা, দানা, জহরত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ মাতৃস্নেহ। বৈষ্ণব পিতা শাক্ত মাতার সন্তান। প্রেম আর শক্তির সমন্বয়ে গড়া অদ্ভুত এক চরিত্র।

তিব্বতের দুর্দান্ত, অসহিষ্ণু মানুষরা যখন তাঁকে হত্যার জন্যে তেড়ে আসতেন তখন তিব্বতী রমণীরা মাঝে পড়ে রামমোহনকে রক্ষা করতেন। তিব্বত নারী স্বাধীনতার দেশ। তুলনায় পুরুষরা অকর্মণ্য, ভীরু। তিব্বতে দ্রৌপদ-বিবাহ প্রচলিত। সব ভাইয়েরা মিলে একটি রমণীকে বিবাহ। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর মতো।

তিব্বতীয় রমণীরা রামমোহনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এঁরাই রামমোহনের হৃদয়ে নারীভক্তির বীজ বপন করে দেন। চল্লিশ বছর পরে রামমোহন মিস কার্পেন্টারকে বলেছিলেন, তিব্বতে আমি শক্তির বীজমন্ত্র লাভ করেছিলুম। তিব্বতবাসিনী রমণীদের স্নেহ, তাঁদের ব্যবহার আমার এক মহাশিক্ষা। অন্য একটা মন, অন্য দুটো চোখ তৈরি হল তাঁদের সংস্পর্শে। নারীর প্রতি ছিল তাঁর চিরশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

হিমালয়ের আরো কয়েকটি দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করে রামমোহন নেমে এলেন বঙ্গে। 'সংবাদ কৌমুদী'তে তাঁর এই দুঃসাহসী ভ্রমণের বৃত্তান্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। তা আর পাওয়া গেল না। দুর্ভাগ্য আমাদের।

তিন

এদিকে ভীষণ অবস্থা। রামমোহনের গৃহত্যাগে পিতা রামকান্তের অবস্থা রাজা দশরথের মতো। রাম গেছেন বনবাসে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লোক পাঠিয়েছেন। রামমোহনকে সাদরে ফিরিয়ে আনতে। ওই পথেই সে ভারতে প্রবেশ করবে।

চার বছর পরে পিতার প্রতিনিধির সঙ্গে রামমোহন ফিরে এলেন। পিতা-পুত্রের মধুর মিলন। মায়ের বুকে মাথা রেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব কতটা জানা হল তিনি নিজেই জানেন না। তবে মায়ের মর্ম বুঝে এসেছেন।

একটা পরিবর্তনের সাক্ষী হবেন রামমোহন। রামকান্তের পরিবার রাধানগর ছাড়বেন এইবার। সাত ভাইয়ের একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার। সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। স্থানাভাব। মাঝে মাঝে মনোমালিন্য।

রামকান্তের আর্থিক অবস্থা এই সময় বেশ সচ্ছল। তিনি ছিলেন বিষয়ী মানুষ। জমিদারি বুঝতেন। বর্ধমানে লাঙ্গুলপাড়ায় নতুন বাসভবন তৈরি হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ন বছরের জন্যে ইজারা নিলেন ভুরসুট পরগনা। এই ইজারার জমিদার হলেন রামমোহনের দাদা জগমোহন। মেদিনীপুরের বেতোয়া পরগনার হরিরামপুর। সেখানে জগমোহনের নামে বিরাট একটি তালুক খরিদ করা হল। রামকান্ত ছেলেদের বিষয়ী করার বিশেষ চেষ্টা চালাতে লাগলেন। রামমোহনকেও ছাড়বেন না।

এদিকে তাঁর নিজের অবস্থা! এই ইজারার সম্পত্তি নিয়ে বর্ধমানরাজের সঙ্গে অনবরত অশান্তি। রাজার দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত রামকান্ত ক্রমশই বিষয় বিরাগী হয়ে উঠছেন। একটি তুলসী-উদ্যান রচনা করে, তার মধ্যে বসে অবিরাম হরিনাম জপ করতেন। রামমোহন একদিন রাজা তেজচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এলেন।

রামমোহন শাস্ত্র, পুরাণাদি পড়তে শুরু করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অন্য কোনো দিকে মন নেই তাঁর। নিবিড় অধ্যয়ন। হঠাৎ তাঁর মনে হল রামায়ণ তো পড়া হয়নি। কি আছে! যুগ যুগ ধরে মানুষ কেন পড়ে? কে রাম? কী ভাবে এল রামধর্ম? রাম সংস্কৃতি! রাম সঙ্গীত! রামায়েৎ সম্প্রদায়! অবতার তত্ত্ব!

প্রাতস্নান করলেন। রামায়ণ নিয়ে বসলেন নির্জন ঘরে। পাঠে নিবিষ্ট। সময়, ঘড়ি, খেয়াল নেই। বেলা দুটো। মধ্যাহ্ন আহারের সময় হল। রামমোহন বলে রেখেছেন, কেউ যেন বিরক্ত না করেন। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটির কাছে কেউ সাহস পাচ্ছেন না যেতে।

মাতা ফুলঠাকুরানী সবাইকে খাইয়ে বসে আছেন উপবাসী। বেলা তিনটে। রামমোহনের সাড়া নেই। রামায়ণে তলিয়ে গেছেন। তিনটে বেজে গেল, পুত্র অভুক্ত। মাতা উদ্বিগ্ন। শেষে রামমোহনের পরম শ্রদ্ধাভাজন এক প্রতিবেশী দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ নয় দরজাটি সামান্য ফাঁক করলেন। পাঠরত রামমোহন বুঝতে পেরে ইঙ্গিতে জানালেন, আর একটু।

একদিনে, একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ-পাঠ সমাপ্ত করে তিনি উঠে এলেন। পিতা এবং মাতা দুজনেই ভেবেছিলেন, দীর্ঘ চারটি বছর পরিব্রাজক জীবনের ক্লেশ রামমোহনকে হয়ত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে আনবে। একটা পরিবর্তন আসবে। কোথায় কী? সেই একই সংঘাত। সেই একই বিদ্রোহ পুতুলে ভগবান নেই। তিনি অনন্ত। তিনি সর্বত্র। ক্ষুদ্র করে তাঁকে খর্ব করা যাবে না, যায় না।

আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ বিটপিলতায়, জলদের গায়ে শশী, তারকায়, তপনে।

ব্রহ্মাণ্ডের কারণ যে একমাত্র নিত্য নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর এবং তাঁহারই উপাসনা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের তাৎপর্য ও তাহাই এদেশের সনাতন ধর্ম।

অসম্ভব। এই রকম এক পুত্রের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা অসম্ভব। পিতা রামকান্তের লড়াইয়ের অস্ত্র লোকাচার আর বিশ্বাস। রামমোহনের অস্ত্র অতি ধারাল— বেদ আর যুক্তি। তর্কে পরাজিত রামকান্ত রামমোহনকে আবার বহিষ্কার করলেন। একই ছাদের তলায় ধর্ম আর বিধর্মের স্থান হতে পারে না। তুমি এমন জায়গায় চলে যাও, যেখানে আমি নেই। কোথায় থাকলে ঠিকানাটা আমাকে জানাবে, মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবো। পিতার কর্তব্য।

রামমোহন কাশী চলে গেলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রেই সত্যের সন্ধান আছে আর কোথাও নেই। স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, পুরাণ। বাকি যা, সবই হল ধর্ম শরীরের পেশীচর্চা। দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হল সেখানকার পণ্ডিত সমাজে জ্ঞানের চর্চায়।

দ্বিতীয়বার কাশী যাওয়া সম্পর্কে দ্বিমত আছে। দ্বিতীয় মত হল, তিনি লাঙ্গুলপাড়াতেই ছিলেন। জমিদারির কাজে পিতাকে সাহায্য করছিলেন। ধর্ম বিষয়ে পিতার সঙ্গে মতান্তর থাকলেও মনান্তর ছিল না।

রামকান্ত রায় তখন সচ্ছল এক জমিদার। প্রচুর সম্পত্তি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িটি সেই সময়েই বারো হাজার টাকা দাম। তিনি একটি উইল করে ছেলেদের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল। বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহাল রয়েছে। ভূসম্পত্তিতে ভূস্বামীদের স্থায়ী মালিকানা। আইন পাস হয়ে গেছে।

তিনপুত্র, জগমোহন, রামমোহন, রামলোচন। লাঙ্গুলপাড়ার বসতবাটি সমান দুভাগ হয়ে গেল। একভাগ জগমোহনের, আর একভাগ রামমোহনের। জোড়াসাঁকোর বাড়িটি পেলেন রামমোহন, আর অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি। রামমোহন বিষয়ী হলেন।

কালের বিচারে রামমোহন হলেন 'কম্‌প্লিট ম্যান'। ঈশ্বরকে যখন পাবে তখন এই সব, এই জগৎ-রঙ্গ থাকবে না। যতদিন না 'একে'র সঙ্গে 'এক' হচ্ছ, ততদিন 'এক' আর 'দুই'-এর খেলা। ঈশ্বর হলেন জ্ঞান সূর্য। জ্ঞানের আলোয় কাজ করো, সে কাজের চেহারা অন্যরকম হবে। রামমোহন লিখে ফেললেন,

অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব, হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্ষেদ, তুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার।
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ ভাব সত্য নির্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু এক মাত্র তিনি হন।।

রামমোহন গ্রাম ছেড়ে কোম্পানি বাহাদুরের কলকাতায় চলে এলেন। পাকাপাকি ভাবে আসবেন আরও আঠারো বছর পরে। কলকাতায় শুরু হল অর্থোপার্জনের চেষ্টা। শুরু হল তেজারতি কারবার আর কোম্পানির কাগজ

কেনা-বেচা। কারবার বেশ ভালই জমে উঠল। দুবছরের মধ্যেই রামমোহন নিজের নামে দুটি তালুক কিনে ফেললেন, একটি গোবিন্দপুরে আর একটি রামেশ্বরপুরে।

কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে কারবার শুরু হল। শুরু হল ইংরেজি শিক্ষা। এই ইংরেজি ভাষায় পরে তিনি অসামান্য অধিকার অর্জন করলেন। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ মনীষী ও লেখকগণ অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলবেন, He has a very great Command of the language.

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যান্ড্রু র‍্যামজেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার দিলেন! আর এক সিভিলিয়ান টমাস উডফোর্ডকে পাঁচ হাজার। সাহেব মহলে রামমোহনের প্রতিপত্তি ক্রমশই বাড়ছে। নিজের নামে যে দুটি তালুক কিনেছিলেন জাহানাবাদ পরগনার গোবিন্দপুরে, আর একটি চন্দ্রকোনা পরগনার রামেশ্বরপুরে। অতি মূল্যবান দুটি তালুক, বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আয়।

পরিবারে মূল ধারা থেকে তীব্র একটি স্রোত বেরিয়ে আসছে এইবার, যার নাম রামমোহন রায়। রামকান্ত রায়ের জীবন এইবার দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে রামকান্তের সম্পর্ক কখনোই ভাল ছিল না। তিনি মহারানী বিষ্ণুকুমারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেই জোরেই তাঁর যত প্রভাব আর প্রতিপত্তি। রানী হঠাৎ মারা গেলেন। বর্ধমান রাজের কাছ থেকে রামকান্ত ভুরসুট পরগনা ইজারা নিয়েছিলেন। ইজারার মেয়াদ শেষ হল। খাজনা বাকি প্রায় আশি হাজার টাকা। এই টাকা শোধ করার মতো সঙ্গতি সেই সময়ে রামকান্তের ছিল না। তাঁর জেল হয়ে গেল। হুগলির দেওয়ানি জেলে আটক রইলেন প্রায় একবছর। রামকান্ত ঝেড়েঝুড়ে নিজের তহবিল থেকে কিছু টাকা বের করলেন, আর বড় ছেলে জগমোহন তাঁর সম্পত্তির খানিকটা বিক্রি করে দেনা শোধ করলেন। রামকান্ত মুক্তি পেলেন।

ছাড়া পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁকে জেলে ঢুকতে হল। বর্ধমানের রাজা আবার একটি পাওনা দেখিয়ে নালিশ করলেন। রামকান্ত নগদ পাঁচশো টাকা দিলেন আর বাকিটা এগারো বছরে কিস্তিতে শোধ করবেন দলিল লিখে দিয়ে মুক্তি পেলেন।

বিপর্যয়ের এখানেই শেষ নয়। খাজনা না দেওয়ার দায়ে জগমোহনের জেল হল। মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে আটক রইলেন পাঁচ বছর। এই বিপর্যয় রামমোহনকে স্পর্শ করল না। পরিবার থেকে তিনি তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

উইলে বিষয় পেলেও, সে-সম্পত্তি গ্রহণ করায় তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। বাবা ও দাদার পাশে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি।

কেন এমন করলেন। রামমোহন আদর্শবাদী। নীতিনিষ্ঠ। সংসারী, বিষয়ী তাঁদেরও একটা ধর্ম তাঁদের ভেতরে থাকা উচিত। বাইরের পুতুলে নয়। মূর্তি, ফুল, চন্দন, ঘণ্টা, মেখলা, নৈবেদ্যের ঘটায় নয়। গোপীনাথকে ভেতরে এনে নিজের নাথ, স্বনাথ যদি নাই করতে পারলে, তাহলে কী করলে সারাজীবন! বিষয় কিনলে, ভোগ করলে, শর্ত অনুযায়ী খাজনাটা দিলে না কেন বছরের পর বছর!

পারিবারিক এই দুর্যোগকে পাশ কাটিয়ে তিনি উত্তর ভারত ভ্রমণে চলে গেলেন। তাঁর নিজের সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দিয়ে গেলেন বর্ধমানের প্রভাবশালী জমিদার বিশিষ্ট বন্ধু রাজীবলোচন রায়কে। দুজনের মধ্যে একটা চুক্তিও হল। রামমোহন তখনও নিঃসন্তান। উত্তর ভারত, হিমালয়, কাশী, প্রবল আহ্বান। যদি আর ফিরে না আসি, তুষারেই যদি সমাধি হয়, বন্ধু রাজীব! তখন তুমি সব দিয়ে দেবে আমার ভাগনে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে।

উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে রামমোহন ফিরে এলেন। এখন তিনি পরিপূর্ণ এক যুবক। রাজসিক চেহারা। রাজসিক বেশ-ভূষা, আদব-কায়দা। সেই রকম বিদ্যা-বুদ্ধি ও চরিত্র। পাটনায় আরবি ও ফারসি পড়তে গিয়েছিলেন। সেই সময় ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। মোগলাই খানা, বেশভূষা, সহবত তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, প্রভাব বিস্তার করেছিল মনে।

কলকাতায় তখন বিরাট ব্যাপার। ইংরেজরা আর পাঁচটা ইওরোপীয় জাতির মতো বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করার জন্যে ভাসতে ভাসতে ভারতে এসেছিলেন। লক্ষ্মীলাভের বদলে সারা ভারতবর্ষটাই লাভ। ব্যবসায়ীদের বিবর্তন হল 'এমপারার'-এ। সম্রাট। টুকরো ভারত টুকরো টুকরো শাসক ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হল অখণ্ড ভারতে। ইতিহাস লিখছে, ক্লাইবের ভিতে হেস্টিংসের গাঁথনি, কর্নওয়ালিসের গঠন ও চরিত্র আরোপ। সাগরপারের সবুজ চোখ। সাজ, সাজ রব।

ইংরেজদের পাকা-পোক্ত কাজ। সাহেব যাঁরা সিভিলিয়ান হয়ে আসছেন এ-দেশে তাঁদের শিখতে হবে এ-দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার। কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'। বিদেশীরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, হু ইজ দ্যাট জেন্টলম্যান? এ কিং? ডিগনিফায়েড, পোর্টলি।

ফোর্টউইলিয়াম কলেজে প্রবেশ করলেই সবাই মুগ্ধ হয়ে রামমোহনকে দেখতেন। এ প্রেজেন্‌স। ম্যানারলি, পোর্টলি, আনলাইক আদার নেটিভস।

মিস্টার জন ডিগবি। একজন সিবিলিয়ান। রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ামে আসতেন মিস্টার ডিগবির সঙ্গে দেখা করতে। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ডিগবি সাহেব হলেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে একটি নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আজীবন সেই বন্ধুত্ব বজায় ছিল। এই যাওয়া-আসার সূত্রে ওই কলেজের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও সদর দেওয়ানি আদালতের কাজি-উস্‌-কাজাত বা প্রধান কাজির হৃদ্যতা তৈরি হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিবিলিয়ান টমাস উডফোর্ডকে রামমোহন এক সময় পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। উঠফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কালেক্টার। উপযুক্ত জামিন দিয়ে রামমোহন তাঁর দেওয়ান হলেন। তাঁর প্রথম চাকরি।

খুব বেশিদিন চাকরি করা সম্ভব হল না। খবর এল পিতা গুরুতর অসুস্থ। বড় অসহায় অবস্থায় রামকান্ত পৃথিবী ছাড়লেন। দু'বছরও হয়নি জেল ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। কপর্দকশূন্য। সম্পত্তির মধ্যে বর্ধমানের বসতবাটি, দাম সাত-আট হাজার টাকা। পঞ্চাশ-ষাট বিঘা নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর জমি। জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন দেনার দায়ে জেলে।

পিতার শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধ বাধল। মাতা তারিনী দেবী অতিকষ্টে কিছু টাকা জোগাড় করে লাঙ্গুলপাড়ার বাড়িতে স্বামীর শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। মা রামমোহনের দুঃসাহসী ধর্মমত সহ্য করতে পারতেন না। রামমোহন কলকাতায় আলাদাভাবে শ্রাদ্ধ করলেন। তারিণী দেবী রামমোহনকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। অমন ছেলেটা কি অদ্ভুত হয়ে গেল। এক বড় একটা ঝড়—রামকান্ত জেলে, জগমোহন জেলে। রামমোহন ইচ্ছে করলে টাকা সাহায্য করতে পারত। পিতার অসুখে পাশে এসে দাঁড়াতে পারত। কিছু করলে না। নিজে আলাদা শ্রাদ্ধ করলে। ব্যবধান ছিল, সেই ব্যবধান আরো বাড়ল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনেরা রামমোহনকে ত্যাগ করলেন।

তাঁরা বলতে লাগলেন, এখন আর দুঃখ করে কী হবে? এর জন্যে তো রামকান্তই দায়ী। অল্প বয়েসে ছেলেটাকে আরবি, ফারসি পড়তে পাটনায় পাঠিয়ে দিলে। ছেলে ফিরে এল মুসলমান হয়ে। কি পড়ে? না কোরান। কি

জ্ঞান দেয়? এক আল্লা, এক ঈশ্বর! কি কপচায়? হাফেজ, রুমি। কি পরে? শক্ত করে পাকানো শালের পাগড়ি। চোপা, চাপকান, পায়জামা! বাড়িতেও মুসলমানী পোশাক। খালি মাথায় থাকেন না তিনি। সব সময় মুসলমানী টুপি। আর কি আহার করেন? পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা। আবার শুতে যাওয়ার আগে মুসলমানদের প্রিয় মেঠাই 'হরিরা'। হিন্দুদের মেঠাই মুখে রোচে না। এইবার পড়েছে সাহেবদের পাল্লায়। কাঁটা, চামছে, ছুরি। দাদুর শাপ কি বিফলে যাবার! সিদ্ধ মহাপুরুষ! কি বলেছিলেন, বিধর্মী হবে। ধর্ম গেলে আর রইলটা কী?

পারিবারিক বন্ধন যতটুকু ছিল পিতার মৃত্যুর পর তাও আর রইল না। পাশে রইলেন অনুগত ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদ। রামমোহন মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন। আবার চাকরি উডফোর্ডের অধীনে। মুর্শিদাবাদের আবহাওয়ায় সাহেব বেশিদিন সুস্থ থাকতে পারলেন না। ছেড়ে ছুড়ে দেশে ফিরে গেলেন।

মুর্শিদাবাদে রামমোহন তাঁর দুই সাহেব বন্ধুকেই এক জায়গায় পেয়েছিলেন, টমাস উডফোর্ড আর অ্যানড্র র‍্যামজে। এই মুর্শিদাবাদে বসেই রামমোহন প্রকাশ করলেন সেই বইটি— 'তুহ্‌ফত্‌-উল-মুত্তয়াহ্‌হিদিন'। বাংলা অর্থ, একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার। মুখবন্ধটি লিখেছিলেন আরবিতে।

প্রখর যুক্তির ওপর স্থাপিত জোরালো একটি লেখা। সমস্ত ধর্মের মূল কথা এক। ধর্মের মূল ভিত্তির ওপর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকম ধর্মের কাঠামো গড়ে তুলেছে। ভিত যে এক, এই সত্যটা কারো স্মরণে নেই। প্রবক্তারা লড়াই করছেন, আমাদের ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, তোমাদেরটা কিছুই নয়। এই কাঠামোগুলির মধ্যে এমনই পার্থক্য, এতটাই বিরোধ যে এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর জন্যে পরলোকে দণ্ডভোগের ব্যবস্থা রয়েছে বলে মনে করেন। পরলোকে প্রকৃত কি ঘটে কেউ জানে না। প্রমাণও দিতে পারবে না। সংস্কার সরিয়ে রেখে যুক্তি আর বুদ্ধির পথে এস। তাকিয়ে দেখ, আকাশের নক্ষত্রের আলো, বসন্তবাতাসের আনন্দ, বর্ষার বারি, স্বাস্থ্য, বাইরের আর ভেতরের যত কিছু ভাল, জীবনের যত আনন্দ সবই সমানভাবে উপভোগ করে।

যার যে ধর্মই হোক, দুঃখ-ক্লেশ, অসুবিধা, অন্ধকার, শীত, মানসিক ক্লেশ, ভেতরের বাইরের যত কিছু মন্দ সবই সমান ভাবে ভোগ করতে হয়। আসল কথাটা হল এই অভ্যাস আর শিক্ষা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। চোখ দেখতে চায় না, কান শুনতে চায় না। সত্যের দিকে পেছন ফিরে থাকা।

এর পর আরো সাংঘাতিক আক্রমণ। সব মানুষকে চারটি শ্রেণীতে ফেলা

যায়। (১) এক শ্রেণীর লোক আছে যারা প্রতারক, তারা মানুষকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যে নানারকম ধর্মীয় মতবাদ নিজেদের মতো করে গড়ে তোলে। মানুষের মধ্যে বিভেদ আর অনৈক্য তৈরি করে। (২) এক দল মানুষ আছে যারা প্রতারিত হয়, যারা অনুসন্ধান না করে অপরের কথায় বিশ্বাস করে। (৩) এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা প্রতারকও বটে, প্রতারিতও বটে। তারা নিজেরা অপরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয় এবং অন্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়ে প্রতারণা করে। প্রকারান্তরে তারা প্রতারকে পরিণত হয়। (৪) আর এক দল, ভগবানের কৃপাধন্য। তাঁরা প্রতারণা করেন না, প্রতারিতও হন না।

ধর্মের মূল কথা, ঈশ্বর এক। যে পথ ধরেই যাও, পথের শেষে সেই এক ঈশ্বর। যে-নামেই চেনো তাকে গড, আল্লা, ভগবান, তিনি সেই 'এক'। 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। ধর্মে ধর্মে পার্থক্য আর বিভেদ স্বার্থান্বেষীদের সৃষ্টি। ধর্ম মানে অন্ধবিশ্বাস নয়। সমস্ত ধর্মমতকেই যুক্তির আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হবে আমার মতে সারবস্তু আছে। আমার পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সেই এক, সেই অদ্বৈত।

এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, আমার আর একটি পুস্তকে আরো বিশদ আলোচনা আছে। বইটির নাম, 'মনাজারাতুল্ আদিয়ান্' (বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা) বইটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১৮০৫ সালের মে মাসে রামমোহনের বন্ধু ডিগবি সাহেব যশোরে বদলি হয়ে এলেন। রামমোহনও এলেন তাঁর সঙ্গে। যশোর থেকে ডিগবি এলেন ভাগলপুরে, সঙ্গে রামমোহন। রামমোহন তখনও সরকারি চাকুরে নন। তিনি ডিগবির খাস ফারসি মুনশি। সেই কারণেই জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় দাঁড়াল-ডিগবির দেওয়ান।

ডিগবি রংপুরে এলেন 'কালেক্টার' হয়ে। সঙ্গে রামমোহন। কয়েক মাসের জন্যে রামমোহনকে দিলেন সরকারি দেওয়ানের পদ। রামমোহনকে স্থায়ীভাবে দেওয়ান করতে চেয়েছিলেন। বোর্ড অব রেভিনিউ দুটি আপত্তি তুললেন দেওয়ানের কাজের অভিজ্ঞতা রামমোহন রায়ের নেই। দ্বিতীয় আপত্তি, রামমোহন রংপুরের যে দুজন জমিদারকে জামিনদার করতে চেয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। স্থানীয় জমিদারের জামিন চলবে না। আর একটি প্রবল বাধা— বোর্ড অব রেভিনিউ-এর প্রেসিডেন্ট বুরিশ ক্রিসপের নিজের হাতে লেখা একটি

মন্তব্য—রামমোহন রামগড়ে যখন সেরেস্তাদার ছিলেন তখন তাঁর কার্যকলাপ সন্তোষজনক ছিল না। অনেক নিন্দা আমার কানে এসেছে।

পরে এই আপত্তি আর রইল না। রংপুরের দেওয়ান হলেন রামমোহন। বন্ধুবর ডিগবিকে বললেন, আমার কয়েকটি সর্ত আছে। তুমি কাগজে লিখে তলায় সই করে দাও—মেনে নিলুম। শর্ত হল কাজের কারণে তোমার সামনে যখন আসব তখন আমাকে বসার জন্যে চেয়ার দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত অন্য আমলাদের যে ভাবে চাকর-বাকরদের মতো হুকুম করা হয়, আমাকে সেই ভাবে হুকুম করা চলবে না। ডিগবি সাহেব কাগজে সই করে শর্ত দুটি মেনে নিলেন।

কয়েক বছর পরে আর এক বাঙালি আসবেন। বীরসিংহ গ্রামে। রামমোহন তার পূর্বাভাস। আর একজন আসবেন কামারপুকুরে। আর একজন আসবেন কলকাতার কলুটোলায় আর সিমলায়। ঊনবিংশ শতাব্দী এক টগবগে কাল। এক একজন আরোহী এক একদিকে ছুটবেন।

চার

১৮০৯। ১ জানুয়ারি। ভাগলপুর। একটা পালকি আসছে। ভেতরে বসে আছেন এক রাজকীয় পুরুষ। মাথায় শালের পাগড়ি, চোগা, চাপকান। মুখে আভিজাত্যের দীপ্তি। চার বেহারার পালকি যাচ্ছে তর তর করে।

পথের ধারে ইটের পাঁজা। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এক ইংরেজ রাজপুরুষ। তাঁর নাম স্যার ফ্রেডেরিক হ্যামিল্টন। তাঁর বাহন, তেজীয়ান একটি ঘোড়া। পাশে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। সাহেব দেখছেন। পালকি আসছে। মোগল আমলে নিয়ম ছিল, সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের সামনে দিয়ে কোনো সাধারণ মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে, কি পালকি বা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবে না। ইংরেজ আমলারাও ওই রকম সম্মানের দাবিদার।

স্যার ফ্রেডেরিক দেখছেন, পালকি হন হন করে চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। আরোহী তাঁকে দেখেছেন, তিনিও দেখেছেন আরোহীকে। পালকি থামল না। আরোহী সসম্ভ্রমে নেমে এল না। আরোহীকে তিনি চিনতে পেরেছেন, রামমোহন। কি 'অডাসিটি', কি ঔদ্ধত্য! কালেক্টরের সামনে দিয়ে সম্মান না জানিয়ে চলে যাচ্ছে?

ফ্রেডেরিক রাগে ফেটে পড়লেন, 'স্টপ, স্টপ, আই সে স্টপ।'

পালকি থামল না। সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে পালকি থামালেন। রামমোহন পালকি থেকে নেমে এসে ভদ্রভাবে সাহেবকে বোঝাতে চাইলেন। সাহেব রাগে অগ্নিশর্মা। নেটিভের এত বড় আস্পর্ধা। ফ্রেডেরিক যা-তা গালাগাল দিতে লাগলেন।

রামমোহন আর একটি কথাও না বলে পালকিতে উঠলেন। বেহারাদের বললেন, 'চলো'। পালকি দূর থেকে দূরে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল। ঘোড়ার পিঠে স্যার ফ্রেডেরিক হ্যামিল্টন, মহামান্য কালেক্টর। রাগে মুখের লাল আরো লাল। ঘোড়া পা ঠুকছে। তারও রাগ।

রামমোহন বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। এই আবেদনপত্রটি রামমোহনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনা। লর্ড মিন্টো স্যার

ফ্রেডেরিককে আদেশ পাঠালেন, দেশীয় মানুষের সঙ্গে সংযত আচরণ করবেন।

রংপুরেই রামমোহনের পরিপূর্ণ বিকাশ। রংপুর কালেক্টরির দেওয়ানপদে রামমোহনের নাম সুপারিশ করে ডিগবি লিখেছিলেন, 'তিনি অভিজাত বংশের, তাঁর শিক্ষার অভাব নেই। তিনি এ কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য।'

রামমোহন দেওয়ানী করলেন পাঁচ মাস। তারপর ডিগবি তাঁকে রংপুরের উদাসী পরগনার লোকান্তরিত জমিদার রাজকিশোর চৌধুরীর নাবালক উত্তরাধিকারীদের অভিভাবক নিযুক্ত করে দিলেন। প্রায় পাঁচবছর তিনি এই দায়িত্বে রংপুরে ছিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় রংপুরের বাসভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হতেন। ফারসি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যে অনেকেই তাঁকে মৌলভী বলতেন। রংপুর তখন জমজমাট জায়গা। বহু মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী তখন রংপুরে। তাঁরাও সন্ধ্যার আসবে আসতেন। তাঁদের কাছ থেকেই রামমোহন কল্পসূত্র ও জৈন ধর্মের অন্যান্য গ্রন্থের সন্ধান পেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই জৈনধর্মের সার-বস্তু তাঁর জানা হয়ে গেল।

রামমোহনের জীবনে সমৃদ্ধি আসছে। অর্থ, বিত্ত, প্রভাব, প্রতিপত্তি, ধর্ম-জ্ঞান। শাস্ত্র যা দিতে চায়, ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম। প্রচুর অর্থ। রংপুরে তাঁর হিসাবে নবীশ ও তহবিলদার ছিলেন ভবানী ঘোষ। কলকাতার তহবিলদার গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রংপুরের সাতবছরের জীবনে তিনি তিনটি তালুক কিনলেন।

বাঙালি যত বড় হয়, তার শত্রুসংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। একদল বাঙালি উঠেপড়ে লাগলেন রামমোহনকে ঘুষখোর বানাতে। এত টাকা আসে কী করে! আর তাঁর ধর্মবিশ্বাসের প্রবল বিরোধিতায় নামলেন, জনৈক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। সংস্কৃত ও ফারসিতে সুপণ্ডিত। রংপুরের জজকোর্টের দেওয়ান। তাঁর অনুগামীর সংখ্যাও কম ছিল না। রামমোহনের মত খণ্ডন করে একটি বই প্রকাশ করলেন, 'জ্ঞানাঞ্জন।'

কে আপনি? চেহারা অনেক বদলালেও, মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি চিনি। তন্ত্রাচার্য হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত রামমোহনের সংশয়ের উত্তরে বললেন, আপনার স্মৃতি থেকে রাধানগর যদি মুছে গিয়ে না থাকে, তা হলে সুখসাগরের কাছে পালপাড়া গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারকে আপনার মনে পড়বে। আমি সেই নন্দকুমার। পরে তন্ত্রসাধনা করে আমি হরিহরানন্দ হয়েছি।

রংপুরে হরিহরানন্দের সঙ্গে পুনর্মিলনে রামমোহন অত্যন্ত উপকৃত হলেন। একটি শাস্ত্র বাকি ছিল, সেটি হল তন্ত্র। রংপুরে হরিহরানন্দের সঙ্গে হৃদ্যতা

হওয়ায় রামমোহনের তন্ত্র-শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হল।

সান্ধ্য আসরে সর্বধর্ম সমন্বয় হত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন, সব ধর্মের মানুষই সমবেত হতেন। রামমোহনের অদ্ভুত আকর্ষণে। রামমোহন তাঁদের দুটি জিনিস বোঝাবার চেষ্টা করতেন। একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার অর্থহীনতা।

রংপুরে রামমোহন একটি বাড়ি করলেন। সর্ব-সাধারণের ব্যবহারের জন্যে একটি দীঘি খনন করালেন। আরো অনেক জনহিতকর কাজ। গোঁড়া হিন্দুরা ছাড়া সকলেই তাঁকে সম্মান করতেন।

রাত বাড়ছে। রংপুরের নিশুতি রাত। সময় মানুষের মাপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢুকে পড়েছে। সভ্যতা তখনো রাতের গলায় আলোর নেকলেস ঝোলাতে শেখেনি। রামমোহনের চোখে ঘুম নেই। চোখ বুজলেই সেই বীভৎস দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠছে।

গ্রামের শ্মশান। চিতা সাজানো হয়েছে। দাদা জগমোহনকে চিতায় তোলা হয়েছে। চারপাশে আত্মীয়-স্বজন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, টুলো পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ গিজ গিজ করছে। যমদূতের মতো কয়েকজনের হাতে মোটা মোটা বাঁশের লাঠি। এই জমায়েত জগমোহনকে চিরবিদায় জানাবার জন্যে নয়। বাড়তি একটা মজা আছে। জগমোহনের জলজ্যান্ত স্ত্রীকে চিতায় তোলা হবে। বউদিকে সতী করা হবে।

সে এক আলাদা আয়োজন। শক্তিশালী বংশদণ্ডধারীদের সমাজ পিতারা ঘুরতে ফিরতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তৈরি থাকবে, সদা সতর্ক। চিতা থেকে লাফ মারতে চাইবে, তখন ওই বাঁশ দিয়ে ঠেসে ধরবে।

রামমোহন বউদিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বারে বারে নিষেধ করেছিলেন, সহমরণে যেও না। হিন্দু সমাজপতিরা বললেন, রামমোহন! যার নিজের কোনো ধর্ম নেই!

চিতায় দুটি শয্যা। মৃত স্বামীর পাশে জীবিতা স্ত্রী। প্রথানুসারে সতীকে পূজা করা হয়েছে। পতি সাক্ষাৎ দেবতা। পরাশর সংহিতা বলছেন,

'তিস্র কোট্যোহধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কাল বস্যে স্বর্গে ভর্তারং সানুগচ্ছতি।।'

সাড়ে তিন কোটি লোম আছে মানবদেহে। যে নারী স্বামীর সঙ্গে সহমৃত হন, তিন সাড়ে তিনি কোটি বছর স্বর্গে বাস করবেন। শ্মশানে তিল ধারণের জায়গা নেই। জগমোহনের স্ত্রী সহমৃতা হবেন। ঢাক-ঢোল বাজছে। কড় কড় শব্দে কাড়া-নাকাড়া। সতীর শেষ বেশ বিন্যাস সমাপ্ত। দেবীর মতো দেখাচ্ছে। নতুন বস্ত্রে। শাঁখা আর সিঁদুরে।

রামমোহন দর্শক। শ্রদ্ধেয়া বউদি অলকমঞ্জরী চিতা প্রদক্ষিণ করছেন। এক পুরোহিত একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলছেন। এইবার অলকমঞ্জরী দেবী চিতায় উঠলেন। স্বামী জগমোহনের মাথাটি কোলে নিলেন। ডান হাতে একটি আম্রপল্লব। চিতায় অগ্নি স্থাপন করবেন গোবিন্দ প্রসাদ।

পুরোহিতের নির্দেশ, মুখে থাকবে হাসি, আর যতক্ষণ পারবে আম্রপল্লবটি নাড়তে থাকবে। তুমুল বাদ্যবাজনা, তুমুল জয়ধ্বনি। লকলকে অগ্নিশিখা। ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে। চন্দনকাঠের গন্ধ। দেহ মাংসের পোড়া, পোড়া গন্ধ। সাড়ে তিন কোটি বছরের জন্যে স্বর্গযাত্রা। 'সদ্য-প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল: গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল-দুটি আলতায় রাঙানো।' (অভাগীর স্বর্গ : শরৎচন্দ্র)।

বাদ্যবাজনা ছাপিয়ে বিরাট হট্টগোল। পালাবার চেষ্টা করছে, পালাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে চেপে ধর। চার পাশ থেকে ঠেসে ধর। জোরে বাজাও, জোরে, আরো জোরে। অলকমঞ্জরীর আর্ত চিৎকার চাপা পড়ে গেল। কাপড়ের ছেঁড়া জ্বলন্ত টুকরো, পোড়া চুলের অগ্নিরেখা বাতাসে ভেসে উঠছে।

স্ট্যাম্প মারার মতো রামমোহনের অন্তর্পটে বউদির সতী হওয়া ছাপা হয়ে গেল। বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে জীবন্ত একজনকে পোড়ানো হচ্ছে। আর হিন্দুধর্ম বাদ্য বাজনা সরবে সোচ্চারে নিজের মহিমা ঘোষণা করছে।

রামমোহন চিতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'দেখে নোবো।'

এই বিকট প্রথাটি এল কোথা থেকে? আলেকজান্দারের আমল থেকে?

সেলুকাস তাঁর ভারত অভিযানের বর্ণনায় লিখছেন, রাজপুতনার এক অনার্য রমণী বিষ খাইয়ে তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছিলেন। বিচারে দণ্ড হল, স্বামীর সঙ্গে একচিতায় পুড়িয়ে দাও। এই সহমরণই কালে সতীদাহ প্রথার জন্ম দিল।

অমরকোষ কি বলছেন? সতী স্বাধ্বী পতিব্রতা নারীর পরম ধর্ম পাতিব্রত্য।

এই পাতিব্রত্য যিনি কায়মনোবাক্যে পালন করেন, তিনিই সতী। বাংলা-প্রবাদ, 'পতির পায়ে যাহার মন তারে বলি সতী।'

খুব ভাল কথা! উত্তম-অতি উত্তম। এর সঙ্গে চালিয়ে দাও কুলীনের কুলধর্ম। বাগনাপাড়ার ঘটনা। এক ব্রাহ্মণের একশো স্ত্রী। ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। তাঁর

সাঁইত্রিশজন স্ত্রী সহমৃতা হলেন। চিতা তিন দিন ধরে জ্বলেছিল। প্রথম দিনে চিতায় উঠলেন তিনজন স্ত্রী। দ্বিতীয় দিনে পনেরো জন, তৃতীয় দিনে উনিশ জন। ধন্য ধন্য ধন্য। মা দুর্গা সতী শিরোমণি।

আরো আছে। জায়গাটার নাম 'উলা'। মুক্তরাম মারা গেছেন। স্ত্রীর সংখ্যা তের জন। তাঁরা সহমৃতা হবেন। ঢাক ঢোল বাজছে। সূর্যার্ঘের মন্ত্র পাঠ চলছে। মন-মন কাঠ দিয়ে সাজানো চিতা। লেলিহান অগ্নিশিখা। এক, দুই, তিন। আগুনে ঢুকছেন। পুড়ে কালো হয়ে ধনুকের মতো কেউ সামনে বেঁকে যাচ্ছেন। কেউ পেছনে। এলো চুল আগুনের বাতাসে ফুলে ফুলে, উড়ে উড়ে ঝুলের মতো হয়ে অগ্নিতে পড়ছে কতক, কতক উড়ে আসছে বাইরে। মাথাটা কালো হতে হতে শব্দ করে ফেটে যাচ্ছে। যত চিৎকার তত পুণ্য।

মুক্তারামবাবুর শেষ দুই স্ত্রী, বারো এবং তেরো, তাঁদের মনোবল ভেঙে পড়ল। তাঁরা দুজনেই যুবতী। হঠাৎ তাঁরা ছুটতে শুরু করলেন, না, না। হিন্দুধর্মের লগুড়ধারী প্রহরীরা, ছুটছে তাঁদের সন্তান। মাকে জাপটে ধরে ছুড়ে দিল আগুনে। জয় জয়কার।

ভোর। রামমোহন জীবনধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের ধর্ম। মানুষটাকে আগে মানুষ হতে হবে। বলিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠ, শিক্ষিত, চরিত্রবান। নিজের মধ্যে নিজেকে থাকতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস আনতে হবে। ভেতরে বিশৃঙ্খলা থাকলে সব কাজই হবে অকাজ।

ভোর চারটের সময় তিনি শয্যাত্যাগ করতেন, উপনিষদের স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে। তারপর এক কাপ কফি। রাজকীয় পোশাক পরিধান করে, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ। সূর্যোদয়ের আগেই প্রত্যাবর্তন। তাঁর একটি গণতান্ত্রিক মন ছিল। সামান্য আনন্দেই প্রিয়জনদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন। সকলকেই সম্বোধন করতেন 'বেরাদার' বলে। আর তাঁকে সবাই বলতেন, 'দেওয়ানজী।'

গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি মানুষ ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে রঙ্গরসিকতা চলত। রামমোহনের মাথায় ছিল লম্বা লম্বা চুল। তাঁর সময়কার ফ্যাসান। স্নানের পর তাঁর সাজগোজ করতে একটু দেরি হত। একদিন এই রকম দেরি হচ্ছে। তাঁর প্রিয় সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনের লেখা একটি গান গাইতে লাগলেন, 'কত আর সুখে মুখ দেখিবি দর্পণে।' তারপরে বললেন, 'কথাগুলো কি অন্যদের জন্যে লিখেছেন?' রামমোহন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ, বেরাদার।'

শুরু হল সকালের কাজ। সেই সময় গোপালদাস তাঁকে খবরের কাগজ

পড়ে শোনাতেন। এক কাপ চা, শুরু হবে ব্যায়াম। ভীমের গদার মতো তাঁর একজোড়া মুগুর ছিল। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ। খেলার মতো হেলায় মুগুর ভাঁজতেন। ব্যায়ামের পর একটু বিশ্রাম। স্নানের আগে পর্যন্ত চিঠিপত্র লেখা। অতঃপর স্নানপর্ব। দুজন খুব বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁকে সরষের তেল দিয়ে ডলাই মলাই করতেন। তেল গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই সময়টুকুও তিনি কাজে লাগাতেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তেন। এরপর স্নান। এটিও দেখার মতো। চৌকিতে বসেছেন; যেন ধ্যানস্থ বুদ্ধ। প্রশস্ত আরক্তিম বক্ষদেশ। গৌরবর্ণ। চারপাশে সাজানো রয়েছে বাইশ ঘড়া জল। প্রথমে ডান হাতে, তারপর বাঁ হাতে, আবার ডান হাতে, অক্লেশে এক একটি ঘড়া তুলছেন আর মাথায় জল ঢালছেন। স্নানও যেন ব্যায়াম!

স্নানের পর অন্দরমহলে আহার। ভারতীয় কায়দায় মাটিতে আসন পেতে বসতেন। থালার চারপাশে গোল করে বাটি সাজানো। বহুবিধ পদ। শুক্তো থেকে পরমান্ন। রাঢ় দেশের মানুষ। কড়াইয়ের ডাল ভীষণ পছন্দ করতেন। পরিবারের মহিলারাই খুব যত্ন করে রাঁধতেন। সরু চালের ভাত। নানা রকমের মাছ অবশ্যই। খানকতক সরুচাকলি।

দুটোর আগে তিনি কিছুই খেতেন না। শুধু চা আর কফি। মধ্যাহ্ন আহার এক মধুর ব্যাপার। ছেলেরা, মেয়েরা, গুরুজনস্থায়ীয় মহিলারা ঘিরে বসেছেন। পাখার বাতাস। বাটি এগিয়ে দেওয়া, ঢেলে দেওয়া। অপূর্ব দৃশ্য।

ছোট্ট একটি দিবানিদ্রার পর কাজ। যাবতীয় লেখাপড়া। বিকেলে ভ্রমণ। সেই সময় অন্দরমহলে এসে কিছুক্ষণ বসে যেতেন। চেয়ার পড়ত তিনখানি। দুখানি দুই স্ত্রীর, একখানি নিজের। স্ত্রীদের আগে না বসিয়ে রাজা বসতেন না কখনো। সেই কালে পুরুষদের এই ভব্যতা, নারীকে এতটা সম্মান প্রদর্শন অভাবনীয় এক ব্যাপার। অন্দরের সবাই উঁকি ঝুঁকি মারত। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, 'দেখ, দেখ, কর্তা দেওয়ানজী দাঁড়িয়ে আছেন, বসবেন না স্ত্রীরা না বসলে।'

১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ডিগবি সাহেব রংপুর কালেক্টরির চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিলেত চলে গেলেন। রামমোহন আরও কিছুদিন রংপুরে চাকরি করে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এলেন ১৮১৫ সালে।

কলকাতায় এক আবির্ভাব। বহুকালের বন্ধ ও বদ্ধ একটি ঘরের জানলা-দরজা একে একে তিনি খুলবেন। গৌরব করে বলবেন, আমি হিন্দু। দেহে, মনে, প্রাণে আমি হিন্দু। অমার গলায় পইতে। আমি গায়ত্রী জপ করি। কে প্রকৃত হিন্দু! তোমরা! যারা কুলীন! বৃদ্ধের একশোটা বউ। যাদের বয়েস পাঁচ

থেকে শুরু। একজন মরলে একশোটি বিধবা। তাদের মধ্যে সাতটা কি সতেরটাকে চিতায় তুলবে সহমরণে যাওয়ার জন্যে। মালকোঁচা মারা যমদূতেরা কাঁচা বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে থাকবে যাতে চিতা থেকে পালাতে না পারে। জ্ঞান হওয়ার আগেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেবে। বিয়ের মর্মটাই যারা বোঝেনি। তোমরা, যারা তেত্রিশ কোটি দেবতার ভজনাই করলে, ঈশ্বরের মর্ম বুঝলে না। তোমরা, যারা শক্তির উপাসনা করে শাক্ত হলে; কিন্তু শক্তিরূপিনী নারীকে মর্যাদা দিতে শিখলে না।

কলকাতা। ফাটাফাটি চলছে সেখানে। পুবে ফেঁড়ে ঢুকছে পশ্চিম। হিন্দু, মুসলমান হাঁ করে দেখছে। মাঝে মাঝে ফিটন গাড়ি যাচ্ছে। আরোহীদের গায়ের চামড়া সাদা। চোখের তারা নীল অথবা সবুজ। ভাষা দুর্বোধ্য। আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু নয়। অন্যরকম টান-টোন উচ্চারণ। এ নাকি ইংরেজি। যারা টুপি মাথায় দিয়ে এসেছে, তাদের কেউ বলছে সায়েব, কেউ বলছে ফিরিঙ্গি, কেউ বলছে গোরা। দু-একটা বাংলা শব্দ বলার চেষ্টা করছে পারছে না, ভেঙে ফেলছে। টাকার 'ট' ঠিক বেরচ্ছে, তুমির 'ত' জিবে আসছে না, হয়ে যাচ্ছে 'ট'। ক্রিয়াপদ মনে হয় পারবে না কোনোদিন। মাঝে মধ্যে দু-একটা বিবি দেখা যায়। মাথায় কার্নিশ বের করা টুপি। ফাঁদালো পোশাক। যারা জানে তারা বলে, ওই পোশাকের নাম গাউন। হাতে হাতপাখা। মাথার ওপর বাহারি ছাতা। কি রূপ। আমাদের খেঁদি, পেঁচি, গোপালের মা, এদের পাশে যেন চাকরানী।

এরা বন্দুক এনেছে, বারুদ এনেছে, জুতো এনেছে, বাইবেল এনেছে, পাদরি এনেছে। রথের চুড়োর মতো চার্চ বানিয়েছে। ক্রুশ এনেছে, খ্রিস্ট এনেছে। বলছে, সবাই খ্রিস্টান হয়ে সায়েব হয়ে যাও। হরি হবে হ্যারি, রাম হবে র‍্যাম। শালগ্রাম দিয়ে পান থেঁতো কর। ভাগবত ফেলে বাইবেল পড়ো।

হিন্দুরা সব উত্তরে গঙ্গার ধারে ধারে ঘোঁট পাকাচ্ছে। মুসলমান আমলের পড়তি জমিদাররা মাঝ কলকাতায় ধেই নাচছে। 'তত্ত্ববোধিনী'-তে লেখা হল 'রামমোহনের কলকাতা।'

> রামমোহন রায় যে সময়ে কলকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না ; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কাল হরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান,

তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়। পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল। ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাকহবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্যালয় হইতে মুক্ত হইতে এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন ; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাঁহাতেই সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ-বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহবা অখ্যাতির ভয়ে, কেহবা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতার গুরুব ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিন বার করিয়া যে

সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকেই জানিতেন কিনা সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার চর্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারও বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যিনি ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তিনি বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ ; এ সকলই পদ্যের ; গদ্যের গ্রন্থ একখানিও ছিল না। বলবুলি ও ঘুঁড়ীর খেলা কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্, সেতার ও তবালাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। পৌত্তলিকতা ছাড়িতে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করিতে তখনকার লোকেরা বাধিত হইয়া ছিলেন।'

এই কলকাতায় রামমোহন এলেন। বয়েস বিয়াল্লিশ। মানিকতলায় লোয়ার সারকুলার রোডে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন আগে থেকেই ইংরেজি কায়দায় একটি বাড়ি তৈরি করে রেখেছিলেন। রামমোহন সেই বাড়িতেই তাঁর বসবাস শুরু করলেন। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন আর চাকরি নয় এইবার যুদ্ধ। ওদিকে ইংরেজের ফোর্ট উইলিয়ম, পিছু হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুরে এসে ধাক্কা খেতে হবে আর একটি বিখ্যাত অবস্থানে সেটি হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। আরও খানিকটা পিছু হেঁটে পিঠ ঠেকে যাবে রামমোহন রায়ের কেল্লায়। বাজবে এবার রণভেরী। যুদ্ধ এইবার হিন্দু ধর্মের অন্ধকার উপাদান ও উপদ্রবের সঙ্গে। যুদ্ধ এইবার বাইবেলধারী পাদ্রিদের সঙ্গে। একটা বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে বঙ্গজীবনের রঙ্গজীবনে। রামমোহন ইতিমধ্যেই কুৎসা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং নানারকম অত্যাচার অক্লেশে হাসিমুখে সহ্য করতে করতে ঘাতসহ একটি পর্বতে পরিণত হয়েছেন। যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন

তার পাশের গ্রাম রামনগরে এক ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর নাম রামজয় বটব্যাল। হিন্দুদের দলপতি। তাঁর দলে চারপাঁচ হাজার লোক ছিল। রোজ ভোরবেলা তিনি দলবল নিয়ে রামমোহন রায়ের বাড়ির সামনে এসে ঘণ্টাখানেক মোরগের ডাক ডেকে যথাস্থানে ফিরে যেতেন। রামজয়ের কষ্টের শেষ ছিল না, দলবল নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবার আসতেন। রামমোহন রায়ের বাড়ির ভেতরে গরুর হাড়, গোমাংস, নানারকম নোংরা জিনিস ছুড়ে ছুড়ে ফেলতেন। কি কষ্ট রামজয়ের! রোজ সন্ধ্যায় পূজাপাঠ ছেড়ে সযত্নে এইসব নোংরা জিনিস সংগ্রহ করে রামমোহনকে আমন্ত্রণ করতে আসতেন। কোথায় গেলেন তাঁর ইষ্ট! ফল ফুল তুলসিপাতা বেলপাতা! রামমোহন এই দলবাজ দলপতিকে কখনও কোনও আক্রমণাত্মক কথা বলতেন না। বরং মিষ্টি কথায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তার ফলে অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। রামমোহন তার পরিবারবর্গকে বললেন—সহ্য কর, দেখবে এক সময় ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হলও তাই।

সবচেয়ে বড় আঘাত এল তাঁর মায়ের দিক থেকে। তিনি রামমোহনকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। রামমোহন তাঁর গ্রামে একটি 'কানট্রি হাউস' তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর তাঁর মায়ের জমিদারি। সেখানে ফুলঠাকুরাণী তাঁকে এক চিলতেও জমি দিতে রাজি হলেন না। রামমোহন সপরিবারে গ্রাম থেকে বিদায় হোক এইটাই তিনি চেয়েছিলেন। শক্ত মায়ের শক্ত ছেলে। রামমোহন তাঁর মায়ের কাছাকাছি থাকবেন বলে পাশের গ্রাম রঘুনাথপুরে শ্মশানভূমির ওপর আকাঙ্ক্ষিত গৃহটি নির্মাণ করলেন। বাড়ির সামনেই নির্মাণ করলেন একটি সুদৃশ্য মঞ্চ। মঞ্চের চারপাশে লেখা হল, 'ওঁ তৎসৎ, একমেবাদ্বিতয়ম।' এই মঞ্চটি তাঁর উপাসনাস্থল। এই মঞ্চে বসেই তিনি ধর্মচিন্তা করতেন, উপাসনা করতেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে স্ত্রীপুত্র নিয়ে এই অসমাপ্ত বাড়িতেই গৃহপ্রবেশ করতে হয়েছিল।

কলকাতা থেকে এসে এবং কলকাতায় যাবার আগে তিনি এই মঞ্চটিকে বার বার প্রদক্ষিণ করতেন। একবার তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী উমাদেবী এই মঞ্চ প্রদক্ষিণের সময় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ? রামমোহন উত্তর দিয়েছিলেন, 'কোনও গাই কালো হয়, কোনও গাই সাদা, কোনও গাই লাল। কিন্তু সব গাইয়ের দুধ সাদা। তেমনি সকল ধর্মের মূল কথা এক। সকল ধর্মই সমান।'

রামমোহনের প্রথম ইংরেজি বই 'An Abridgment of the Vedanta'। বইটি ছোট আকারের হলেও সেটি সারা ইউরোপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মূল বক্তব্য ধর্মীয় অজ্ঞতা থেকেই কুসংস্কারের উদ্ভব। প্রকৃত ধর্ম কী? পুরোহিতের ধর্ম পুরোহিতদের মতোই। তাঁরা নিজেরা যেমন বোঝেন ঠিক সেই

ভাবেই অপরকে বোঝান। নিজেরা ঠিক বুঝেছেন কি না সেটি জানতে চেষ্টা করেন না। খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে বহু দেবদেবীর উপাসনা নেই। রামমোহন এই দুটি ধর্মের দৃষ্টান্ত না টেনেই হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ ও বেদান্তের উল্লেখ করে দেখাতে চাইলেন ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। হিন্দুরা কি সেকথা ভুলে গেলেন! উপনিষদের বাণীকেই তিনি তুলে ধরতে চাইলেন, বোঝাতে চাইলেন উপনিষদ নিরাকার একেশ্বরবাদের কথাই বলেছেন। বলেছেন খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের বহু আগে। রামমোহন প্রথমে বাংলায় লিখলেন বেদান্তসার। তারপরে প্রকাশিত হল এই গ্রন্থের হিন্দি সংস্করণ। তারপরে ইংরেজি।

এই বইটি পৌত্তলিক হিন্দুদের ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতোই সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। রামমোহন লিখলেন, 'সাকারবাদীরাই স্বীকার করেন যে নারদ, জনক, সনৎ, কুমারাদি, শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কপিল প্রমুখ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে ওই সব শাস্ত্রেই লেখা আছে যে উহা ব্রহ্মের রূপকল্পনা মাত্র। যেহেতু ঈশ্বর অপরিমিত ও অতীন্দ্রিয় তাঁর প্রতিমূর্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না! ঈশ্বর কোনও স্থানে অধিক কোনও স্থানে অল্প আছেন ইহা অত্যন্ত অসম্ভব।'

রামমোহন ইংরেজি বেদান্ত সূত্রের ভূমিকায় লিখলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের (যাঁহাদের সাংসারিক সুখ বর্তমান ধর্মপ্রণালীর উপর নির্ভর করে) তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন অধিক হউক না কেন, আমি এই বিশ্বাস ধীর ভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিবেন হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্তত এই সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য, যিনি গোপনে দর্শন করিয়ে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।'

রামমোহন আরও চেয়েছিলেন, ইউরোপীয়েরা বুঝুন প্রকৃত হিন্দুধর্ম কতটা উদার কত সুমহান কি বিশাল তার বিস্তার! হিন্দুরা পরব্রহ্মের উপাসক। রামমোহন প্রথমে স্থাপন করলেন আত্মীয় সভা। উদ্দেশ্য-ধর্মানুশীলন, সত্যানুসন্ধান আর ধর্মীয় বিষয়সমূহের খোলাখুলি আলোচনা। অনেকেই আসতেন এই আত্মীয় সভায়। সকলেই যে ধর্মালোচনার জন্যে আসতেন তা নয়। অনেকে অন্য

ব্যাপারে রামমোহনের মতো মানুষের পরামর্শ নিতে আসতেন। আবার অনেকে আসতেন নামজাদা মানুষটিকে দেখতে ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে। প্রত্যেককেই তিনি ফারসি ভাষায় সম্বোধন করতেন 'বেরাদার।' আত্মীয় সভার বৈঠক বসত রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে। সভার অনুষ্ঠান হত এইভাবে—পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র শাস্ত্রপাঠ করতেন। কোনও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ রামমোহনের লেখা গানগুলি গাইতেন। এরপর আত্মীয়সভা চলে গেল সিমলা হাউসে। তারপরে গেল বড়বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে।

বিহারীলাল চৌবের বাড়িতেই মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সুবিখ্যাত শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধ হয়েছিল রামমোহনের সঙ্গে। শাস্ত্রী মশাই আস্ফালন করে বলেছিলেন, বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নেই। তাই তোমাদের রামমোহন রায় বেদান্তের দোহাই দিয়ে যা খুশি প্রচার করছেন। আমি বেদ থেকেই প্রমাণ করব, প্রতিমাপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা।

কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছেন তর্কযুদ্ধের অঙ্গনে। নিরাকার আর সাকারের লড়াই। রাজা রাধাকান্ত দেব এসেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণনা : 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার হইবে এই বার্তা শহরে প্রচার হইলে সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রামমোহন সদলে, হিন্দু-সমাজপতি রাধাকান্ত দেব পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব সহ সভাস্থলে উপনীত হইলেন। বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সমক্ষে হাঁ করিতে পারিলেন না। কেবল রামমোহন রায়ের সহিত সমানে সমানে বাগযুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী পরাভব স্বীকার করিলেন। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। রামমোহন রায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন—এই বার্তা যখন তড়িতবার্তার ন্যায় সহরে ব্যাপ্ত হইল, তখন তাঁহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল।' রামমোহন হলেন আধুনিক শঙ্করাচার্য।

কলকাতায় রামমোহনের তখন দুটি বাড়ি। একটি আপার সার্কুলার রোডে। মানিকতলা 'গার্ডেন হাউস' নামে পরিচিত। আর একখানি আমহার্স্ট স্ট্রিটে, নাম 'সিমলা হাউস'।

রামমোহন-অনুরক্ত, অনুরাগীদের একটি দল তৈরি হল। তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হলেন রামমোহনের বৈঠকখানায়। হিন্দু সমাজকে একটা নাড়া দিতে হবে। নিশ্চিন্ত নিদ্রা থেকে টেনে তুলতে হবে। নবজাগরণ।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহনের একান্ত সহযোগী। চারটি ক্ষেত্র

সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম ও শিক্ষা। ঢেলে সাজাতে হবে। আরও দুই ঠাকুর এগিয়ে এলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর। রমানাথ হলেন দ্বারকানাথের এক ভাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র। প্রসন্নকুমার পরবর্তীকালে শ্রদ্ধার আসন পাবেন বিখ্যাত আইনবিশারদ রূপে।

রমানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর দু'জনে মিলে প্রকাশ করেছিলেন একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক— রিফর্মার। 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব নলেজ' বা জ্ঞানার্জন সভার সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠলেন। তারাচাঁদের সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বারকানাথ জর্জ টমসনকে ভারতে এনেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত। দেশের লোককে দিয়েই দেশের শাসকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। শাসকদের মানবিক করার প্রচেষ্টা। টমসনের সঙ্গে যোগ দিলেন তারাচাঁদ, রামগোপাল প্রমুখরা। এঁরাই পরে 'চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শন' নামে পরিচিত হলেন।

রামমোহনের দল আরো বড় হল। যোগ দিলেন টাকীর কালীনাথ আর বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, কলকাতার কাশীনাথ ও মথুরানাথ মল্লিক, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, চন্দ্রশেখর দেব, জয়কৃষ্ণ সিং, রাজা বুদ্ধিনাথ রায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আর একজন এগিয়ে এলেন। তিনি সাহেব। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের রেভারেন্ড উইলিয়াম য়্যাডাম।

'এক'-এর প্রবক্তা রামমোহনের খারিজী-যুক্তি খ্রিস্টের ধর্মবাদের 'ট্রিনিটি'-কেও স্পর্শ করেছিল। ঈশ্বর তিনের সমন্বয়, পিতা, সন্তান এবং পবিত্র আত্মা। না। তা কেন? ঈশ্বর এক এবং একক। য়্যাডাম 'ট্রিনিটারিয়ান' মতবাদ পরিত্যাগ করে 'ইউনিটারিয়ান' মতবাদ গ্রহণ করলেন।

খ্রিস্টীয় মহলে তুমুল আন্দোলন। কলকাতার বিশপ ইংল্যান্ডে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে লিখলেন, 'য়্যাডামকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক।' অ্যাটর্নি জেনারেল উত্তর দিলেন, 'সে দিন আর নেই।'

এই রূপান্তরের সূত্রপাত যেন দৈব ঘটনা। য়্যাডামের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যীশুর উপদেশাবলী বাংলায় অনুবাদের। য়্যাডাম এই কাজে সাহায্য পাওয়ার জন্যে রামমোহন ও আর একজন মিশনারি মিঃ ইয়েটসের কাছে যাতায়াত করতেন। তিনজন একসঙ্গে বসে কাজ করতেন। অনুবাদের কাজ করতে করতে আলোচনা ও বিতর্ক। যীশুর ঈশ্বরত্ব রামমোহন মানবেন না।

মানবেন না তাঁর অলৌকিকত্ব। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। নৈয়ায়িক রামমোহন একের পর এক অস্ত্র বের করে বাইবেলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে দিতেন। দুই সায়েব রামমোহনের পাণ্ডিত্যের সামনে খুব অসহায় হয়ে পড়তেন। শেষে ইয়েটস ভয়ে পালিয়ে গেলেন। রইলেন য়্যাডাম। য়্যাডাম সমানে তর্ক চালিয়ে গেলেন। যদি রামমোহনকে 'ত্রয়ীশ্বরবাদে' বিশ্বাসী করা যায়। অসম্ভব। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতেই লাগল, শেষে য়্যাডাম পরাস্ত হলেন। ত্রয়ীশ্বর মতবাদ পরিত্যাগ করলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন আমি 'ইউনিটারিয়ান'।

য়্যাডামের এই ঘোষণায় শ্রীরামপুরের পাদরীরা ভীষণ চটে গেলেন। তাঁদের রাগ আরো বেড়ে গেল। রামমোহন প্রকাশ করলেন একটি বই—The Precepts of Jesus, the guide to Peace and Hapiness. বইটিতে রইল যীশুর নৈতিক শিক্ষা। অলৌকিক সব বাদ। শত্রু-মিত্র সবাই অবাক। রামমোহন কী করতে চাইছেন! তাঁর আক্রমণ থেকে কোনো ধর্মেরই কি পরিত্রাণ নেই! না নেই। ঈশ্বরকে প্রকৃত জানতে হলে অলৌকিক ব্যাপারসমূহ বর্জন করতে হবে। তিনি বিরাট, অসীম, অনন্ত। ক্ষুদ্রের সীমায় তিনি ক্ষুদ্র হয়ে ধরা দিতে পারেন না। প্রকাশের পেছনে যে অপ্রকাশ তাকে জানতে হবে ধীশক্তি দিয়ে। আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে নয়।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।

শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ পাদরীরা রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করলেন। তাঁদের হাতে তখন দুটি পত্রিকা 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ও 'সমাচার দর্পণ'। রামমোহন একজন অবিশ্বাসী, অখ্রিস্টান। তাঁর এই অনধিকার চর্চা অসহ্য। খ্রিস্ট ধর্মের তিনি কি জানেন!

রামমোহন মূল বাইবেল পড়লেন হিব্রু আর গ্রীক ভাষায়। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ও সমাচার দর্পণ' তাঁর উত্তর ছাপাতে রাজি হলেন না। রামমোহন নিজেই একটি সাপ্তাহিক প্রত্রিকা প্রকাশ করলেন, 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, হিন্দুদের বহু দেবতা আর খ্রিস্টানদের ত্রয়ীশ্বরবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

রামমোহন খ্রিস্টীয় সমাজের উদ্দেশে তিনটি আবেদন প্রচার করলেন, 'অ্যাপিল টু দি খ্রিস্টীয়ান পাবলিক'। শাণিত যুক্তি অগাধ পাণ্ডিত্য। পক্ষ, বিপক্ষ

উভয়েই বিস্মিত। আবেদনের প্রথম দুটি শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ছেপেছিলেন। তৃতীয়টি তাঁরা ছাপলেন না।

রামমোহন ধর্মতলায় নিজেই একটি প্রেস স্থাপন করলেন 'ইউনিটারিয়ান প্রেস'। সেই প্রেস থেকে প্রকাশিত হল তাঁর তৃতীয় আবেদনটি।

সেবার প্রচণ্ড গরম পড়েছে কলকাতায়। দুপুরবেলা। রামমোহন ঘামতে ঘামতে য়্যাডামের বাড়িতে এলেন। ভীষণ উত্তেজিত। সাহেব তাঁর চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। রামমোহন বললেন, শীগ্‌গির জল আনো।'

গায়ের জামা খুলে ফেললেন।

'কিছু মনে করো না ভাই। অসভ্য হতে বাধ্য হচ্ছি।'

জল খেয়ে শান্ত হয়ে বললেন, 'আজ আমার জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে। খুব দুঃখ পেয়েছি। বিশপ মিড্‌লটন আমাকে বলেছেন, আমি যদি খ্রিস্টান হই তাহলে আমার আরো পদোন্নতি হবে। ছি! ছি! আমায় এত ছোটলোক মনে করে।'

রামমোহন আর কখনো বিশপের মুখদর্শন করেননি। রামমোহন বলতেন, 'আমি হিন্দু ইউনিটারিয়ান'। য়্যাডাম ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে বেরিয়ে আসায় তাঁর বড় দুর্দিন। তাঁকে স্থান দেওয়ার জন্যে রামমোহন 'ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমটি' গঠন করলেন। এই কমিটিতে কয়েকজন ইওরোপীয় ছিলেন, আর ছিলেন, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ। রামমোহনের দুই পুত্র রাধাপ্রসাদ আর রমাপ্রসাদ। দু'জনেই তাঁর জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর সন্তান। কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবী ছিলেন নিঃসন্তান। রাধাপ্রসাদ আর রমাপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান আঠারো বছর।

রাধাপ্রসাদ ইউনিটারিয়ান কমিটিকে একখণ্ড জমি দান করতে চাইলেন। অ্যাংগ্লো হিন্দুস্কুলের পাশে। সেখানে স্থাপিত হবে একটি বিদ্যালয় আর একটি উপাসনালয়। এই দুটি নির্মাণে চারহাজার টাকা লাগবে। বৃটেনের ইউনিটারিয়ানরা ১৫০০০ টাকা পাঠালেন।

প্রথমে ভাড়া বাড়িতে কাজ শুরু হল। সেই বাড়িতে 'হরকরা' সংবাদপত্রের অফিস। ১৮২৭ সাল, ৩ আগস্ট, রবিবার। পূর্বাহ্ন। প্রথম উপাসনা। বর্ষার বাংলা। মেঘভাঙা রোদ। ঝলমলে দিন। ঝলমলে উদ্দেশ্য। কলকাতার প্রাচীনপন্থী সমাজের বুকে একটি নতুন দীপ। উপাসনা পরিচালনা করলেন অ্যাডাম সাহেব।

চমৎকার শুরু। রামমোহন প্রবল উৎসাহে খ্রিস্টের 'সার্মন অন দি মাউন্ট-এর সংস্কৃত অনুবাদ শুরু করলেন। প্রবল ইচ্ছা, খ্রিস্টের সমস্ত উপদেশ সংস্কৃতে অনুবাদ করবেন। বেদ আর বাইবেল পাশাপাশি। কমিটির ইওরোপিয়ান

সভ্যদের তালিকায় আছেন, সুপ্রিম কোর্টের একজন কৌঁসুলি, থিয়োডর ভিকিনস, ম্যাকিনটস কম্পানির এক বণিক, জর্জ জেমস গর্ডন, একজন অ্যাটর্নি, উইলিয়াম টেট, কম্পানির এক সার্জেন, একজন কর্মচারী নর্ম্যান কার। সকলেই স্কটল্যান্ডের মানুষ।

আশ্চর্য এক প্রতিভা, অত্যাশ্চর্য এক আগমন এই রামমোহন রায়। গ্রিক ভাষা শিখলেন নতুন বাইবেল মূল থেকে সরাসরি পড়বেন বলে। একজন ইহুদী শিক্ষক নিযুক্ত করে ছ'মাসের মধ্যে হিব্রু শিখলেন মূল থেকে পুরনো বাইবেল পড়বেন বলে।

অস্বাভাবিক মেধা, অসাধারণ মেধা। যা করবেন, তা করবেনই। বিরুদ্ধ পক্ষের রটনা অথবা সত্য, 'আহারটা একবার দেখো, রোজ বারো সের দুধ ও একটি পাঁঠা। পরিমিত সুরা পান।'

একদিন য়্যাডামের আবাসে উপাসনা শেষ করে রামমোহন বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রশেখর দেব। তিনি বললেন, 'দেওয়ানজী, বিদেশির বাড়িতে গিয়ে আমরা উপাসনা করি। আমাদের নিজেদের একটা উপাসনার জায়গা করলে কেমন হয়।'

রামমোহন চিন্তিত হলেন। মন্দ বলেনি চন্দ্রশেখর। ইউনিটারিয়ান আন্দোলন নানা কারণে তেমন দানা বাঁধছে না সদস্যদের উৎসাহের অভাবে। তবে পাদরিরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন, আরো পাবেন। হিন্দু ধর্মের ফ্রন্টে ধাক্কা খেয়ে তাদের টনক নড়েছে। তোমরা প্রথম তিরিশ বছর আমাদের ধর্মে হাত দাওনি। বিলেতও সেটা পছন্দ করত না। তারপর শুরু হল পাদরিদের উৎপাত। তাঁরা এখন তিনটি উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার। তাতে আছে হিন্দু দেব দেবী ও ঋষিদের কুৎসা আর মুসলমান ধর্মের নিন্দা। দ্বিতীয় উপায়, রাজপথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে অন্যের ধর্মের নিন্দা আর নিজেদের ধর্মের মহত্ত্ব ঘোষণা। হেঁকে ডেকে বলছ, তোমরা সব খ্রিস্টান হয়ে যাও। পৃথিবীতে খ্রিস্টানরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ মানুষ। তৃতীয় উপায়, প্রলোভন। দুঃখী লোককে চাকরির লোভ, প্রতিপালনের লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান করা।

শোনো ভাই, আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আর তোমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার সাপেক্ষ। তোমাদের হাতে দেশ-শাসনের ক্ষমতা, তাই ধর্মের নামে এই অত্যাচার। যদি সাহস থাকে যাও না তুরস্কে কি পারস্যে, যেখানে রাজশক্তির ধর্ম নেই, প্রচার করে এস তোমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কেমনভাবে অক্ষত থাক দেখি। রাজশক্তির সাহায্যে দুর্বল প্রজার ওপর অত্যাচার জঘন্য অপরাধ।

তোমরা চীনদেশে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে এই একই পদ্ধতি

নিয়েছিলে। মার খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে চিৎকার করেছিলে সৈন্য পাঠাও, সৈন্য পাঠাও।

যীশু এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে কি বন্দুক ছিল! ধর্মের জয়ে তাঁদের জীবন বিসর্জন কি ভুলে গেলে ভাই। ধর্মের জন্যে বন্দুক যত মহান ধর্মই হোক তার ঐশ্বর্য হরণ করে। তোমরা তোমাদের নিজেদের ধর্মকেই হত্যা করছ। পরাজিত ধর্ম যতই মহান হোক বিজেতার ধর্মের কাছে হেয় হবেই। নিরীশ্বরবাদী, হিংস্র পশুতুল্য চেঙ্গিজ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল গ্রাস করেছিল। এদেশবাসীদের ঈশ্বরনিষ্ঠা আর পরলোক বিশ্বাসকে তারা উপহাস করত। অত্যাচারী মগদেরও কোনো ধর্ম ছিল না। তারা পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করে হিন্দুদের ধর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। একেশ্বরবাদী ইহুদীরা, পৌত্তলিক গ্রিক ও রোমীয়দের প্রজা ছিল। ইহুদেদের ধর্ম, আচার-ব্যবহারকে তারা উপহাস করত।

খ্রিস্টধর্মের মহান প্রচারকগণ! আপনারা আমাদের ধর্মের কিছুই জানেন না, আমাদের ঋষি ও ব্রাহ্মণদের সরল জীবনচর্যা সম্পর্কে আপনাদের কোনো জ্ঞান নেই। আমি রামমোহন। আমার সঙ্গে বিচারে বসুন।

মার্সম্যান তর্কে পরাজিত। 'ইন্ডিয়া গেজেটের' ইংরেজ সম্পাদক লিখলেন, রামমোহন ইজ গ্রেট। তাঁর সমতুল্য এ-দেশে কেউ নেই। এই সংবাদ ইওরোপে ভেসে গেল। খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক তাঁর সমস্ত বই লন্ডনে প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল আমেরিকায়। ইওরোপের মানুষ অবাক। ভারতে এমন সুপণ্ডিত মানুষ আছেন।

'হরকরা' ও 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ায়' তর্কযুদ্ধে হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার টাইটলার পরাভূত হলেন, এই যুদ্ধে রামমোহন অসাধারণ এক কায়দা অবলম্বন করেছিলেন। 'হরকরা'য় টাইটলার' প্রথমে রামমোহনের প্রবল আক্রমণ করলেন। সেই আক্রমণকে সমর্থন করে জনৈক রামদাস লিখলেন, 'রামমোহন রায় পৌত্তলিক হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টিয়ান উভয়েরই পরম শত্রু। রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতারবাদ উভয়েরই প্রতিবাদী। ঐ দুটি মতই হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টিয়ান, উভয়েরই মূল মত। সুতরাং এস, আমরা একত্রে মিলিত হয়ে আমাদের সাধারণ শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি।'

টাইটলার 'রামদাসের' ফাঁদে পা দিলেন। এতবড় স্পর্ধা একজন ঘৃণিত পৌত্তলিক খ্রিস্টানের সঙ্গে সাধারণ ভূমিতে দাঁড়াতে চায়। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের তুলনা। ধুন্দুমার লড়াই। শেষে রামদাসেরই জয়। 'রামদাস' আর কেউ নন, স্বয়ং রামমোহন।

রামমোহন পাদরি-সাম্রাজ্যে একটি গ্রেনেড ছুড়লেন। প্রকাশিত হল 'পাদরি

ও শিষ্যসংবাদ'।

'এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য,
ইহাদের পরস্পর কথোপকথন'

পাদরি।। ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি অনেক?

প্রথম শিষ্য।। ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয়।। ঈশ্বর দুই।

তৃতীয়।। ঈশ্বর নাই।

পাদরি।। হায় কি মনস্তাপ! শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর ন্যায় উত্তর করিলে?

সকল শিষ্য।। আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ-ধর্ম যাহা আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন; কিন্তু আমাদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদরি।। তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য।। আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্বক শুনিয়াছি, এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্ছা রাখি না, কিন্তু আপনকার উপদেশ আমাদিগের আশ্চর্য বোধ হইয়াছে।

পাদরি (প্রথম শিষ্যকে)।। তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে কি রূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?

প্রথম শিষ্য।। আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোস্ট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমার দিগের গণনামতে এক, এক এক অবশ্য তিন হয়।

পাদরি।। আহা! আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মূঢ়। আমার অর্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ। আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য।। যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক। এ নিমিত্ত যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরি।। হা এমত নহে। তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না, এবং তাহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে, এমত জানিওনা, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য।। এ অতি অসম্ভব, এবং আমরা চীনদেশীয় লোক, পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরি।। ওহে ভাই! এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য।। এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়?

পাদরি।। এ নিগূঢ় বিষয় হয়। কিন্তু আমি জানি না কি রূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য (হাস্য করিয়া) ।। মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরি।। আহা! স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে। চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে।

(দ্বিতীয় শিষ্যকে) কি রূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয় শিষ্য।। অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি সংখ্যায় ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরি।। আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে, ঈশ্বর দুই হয়েন? সে যাহা হউক তোমাদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য।। সত্য বটে, আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশ্বর দুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই হয়।

পাদরি।। তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য।। আমরা চীন দেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি। আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিনি ব্যক্তি পৃথক পৃথক পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন, বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।

পাদ্‌রি।। কি বিপদ! এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়।

পাদ্‌রি।। (তৃতীয় শিষ্যকে) তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহার দিগের অপেক্ষাও অধম হও। কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য।। আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি; সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। অতএব,

এই অন্তঃকরণবর্তী করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদরি।। এ যথার্থ বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য।। এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক বস্তু বর্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে, এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক।

পাদ্‌রি।। এ দৃষ্টান্ত কি রূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে?

তৃতীয় শিষ্য।। আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমারদিগের ন্যায় নহে, আপনকার দিগের দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না। কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

পাদ্‌রি।। আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জনার জন্যে প্রার্থনা করিব। কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করিলে না। অতএব, তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য।। এ অতি আশ্চর্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না এমন ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি।

চারশো বছর আগে শ্রী চৈতন্য কাজি দলন করেছিলেন। ব্রাত্য মানুষদের তাঁর তৈরি উদার ধর্মে কোল দিয়ে বলেছিলেন, 'হরি বলো', তাহলেই তুমি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। হিন্দু ধর্মের পুরোহিত সংস্করণের অত্যাচারে মুসলমান হতে হবে না। চারশো বছর পরে রামমোহনের পাদরি দলন। হিন্দুধর্মের নব সংস্করণে নাক উঁচু বাঙালি হিন্দুদের আকর্ষণ। মনসা,শীতলা, ঘেঁটু, ঘণ্টাকর্ণ থাক, শিক্ষিত মানুষের জন্যে বেদাশ্রিত একটি আশ্রয়।

ব্রাহ্মসমাজ

আত্মীয় সভা, ইউনিটারিয়ান কমিটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশান, ব্রাহ্মসমাজ। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব মাথায় ঢোকালেন সম্পূর্ণ নিজেদের একটি উপাসনাস্থল। বিদেশীদের সংস্রব বর্জিত। রামমোহন প্রিন্‌স দ্বারকানাথ ও টাকী নিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে পরামর্শ

করলেন। নিজের বাড়িতে একটা সভা ডাকলেন। এলেন দ্বারকানাথ, কালীনাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হাবড়ানিবাসী মথুরানাথ মল্লিক। সকলেই স্বীকার করলেন, উত্তম প্রস্তাব. আসুন আমরা সকলে লেগে যাই।

জোড়াসাঁকো। চিৎপুর রোড। ভাড়া নেওয়া হল কমললোচন বসুর বাড়ি। কমললোচন পর্তুগিজ বণিকদের অধীনে কাজ করতেন। সেই কারণে সবাই বলতেন ফিরিঙ্গি কমল বসু। ভাদ্রমাস। ৬ ভাদ্র, ১৮২৮ স্থাপিত হল উপাসনা সভা। সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা-সভার কার্যকাল। দুজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ, আর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। রামচন্দ্র বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন। তারপর সঙ্গীত ও সভা শেষ। সভায় বেশ শ্রোতা সমাবেশ হতে লাগল। কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দুরা যোগ দিতে লাগলেন। ভারি ভারি চেহারা, সুন্দর সুন্দর পোশাক। বাইরে ফিটনের সারি। ভেতরে তত্ত্ব আলোচনা। সাধু বাঙলায় সম্বোধন। পাশেই জোড়াসাঁকো। বালক দেবেন্দ্রনাথ বড় হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তখনো দূরে।

কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হল। পাশেই কেনা হল একখণ্ড জমি। নির্মিত হল নিজস্ব সমাজ গৃহ। দলিলটি গবেষকগণ উদ্ধার করেছেন।

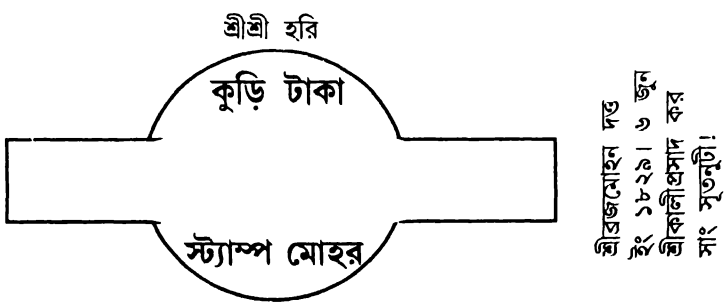

মহামহিম শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসাদ কর ওলদে ৺বৈষ্ণবচরণ কর এবনে রামশঙ্কর কর কস্য জমী বিক্রয় করলা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে সহর কলিকাতা সুতানুটি গ্রামের মধ্যে আমার পৌত্রীক বসতবাটী যে আছে ইহার চৌহদ্দী চিৎপুর রোডের পূর্ব্বধার ফুলবিতরণের বাটীর দক্ষিণ ৺রামকৃষ্ণ করের বাটীর উত্তর রাধামণি ব্রাহ্মণীর বাটীর পশ্চিম এই চত্তর সীমার মধ্যে আসায় পৌত্রীক খরিদা পাট্টাই

জমী মায় এমারত কম বেশ ৪॥ চারি কাঠা অর্দ্ধপুয়া আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। ঐ চারি কাঠা অর্দ্ধপুয়া জমি মায় এমারত মহাশয়াদিগের নিকট চিরকাল কৃষ্ণসমাজের নিমিত্তে মবলগে শিক্কা ৪২০০ চারি হাজার দুইশত টাকা পোনে বিক্রয় করিলাম। জমি মজকুরা আমুল মামুল মাফিক আমল দখল করিয়া মহাশয়রা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদাসএ খরিদ করিতেছেন তদাসয় পরন্তু চিরকাল করিবেন আমি কি আমার উত্তরাধিকারির সহিত কস্বীন কালে দাত্তা নাই দাত্তা করি কিংম্বা কেহ করে সে ঝুটা ও বাতিল এতদার্থে পোনের বেবাগ টাকা দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ বার সত্ত ছত্রষি সাল তারিখ ২৮ জৈষ্ঠী।

ইসাদী

শ্রীরামধন মালাকার
সাং সিমিলা

শ্রীকালীনাথ কর
সাং সুতানুটী

শ্রীবংশধর আমদার
সাং কলিকাতা

রসীদ রুপেয়া বাবুদী উপরের লিখীত জমি মায় এমারত বিক্রয়ের পোন সন ১২৩৬ সাল তাং—

আসামী	রুপেয়া	
নিজরোজ		শ্রীকালীনাথ কর
গুঃ খোদ	৪২০০	সাং সুতানুটী
রোক শিক্কা		

ইসাদী

শ্রীকাসীনাথ কর
সাং সুতানুটী

শ্রীরামধন মালাকার
সাং সিমিলা

শ্রীবংশীধর আমদার
সাং কলিকাতা।"

ষ্ট্যাম্প
কুড়ি টাকা

[রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ কর্তৃক রক্ষিত ছিল]

চারকাঠা আধপোয়া জমি। তার সঙ্গে একটি গৃহ। চার হাজার দুশো টাকা।

১৮২৯ সালের ৬ জুন। স্ট্যাম্প বিক্রেতার নাম ব্রজমোহন দত্ত। বিক্রেতা, কালীপ্রসাদ কর। জোড়াসাঁকো তখনো সুতানুটি। রামমোহন রায় তখনো দেওয়ান। রাজা উপাধি পাননি। তখনো ব্রাহ্মসমাজ নাম হয়নি। ব্রহ্মসভা।

১৭৫১ শক, ১১ মাঘ, ১৮২৯, নতুন গৃহে সমাজের কাজ শুরু হল। প্রথম, প্রথম ভাদ্রমাসে সাম্বৎসরিক উৎসব হত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নিমন্ত্রিত হতেন। প্রচুর অর্থ তাঁদের বিদায় দেওয়া হত। সমস্ত খরচ সামলাতেন দ্বারকানাথ, মথুরানাথ আর কালীনাথ।

প্রতিষ্ঠা উৎসবে একজন মাত্র ইয়োরোপীয় ছিলেন—মন্টগোমেরি মার্টিন। 'হিস্ট্রি অব দি ব্রিটিশ কলোনির' লেখক। তিনি লিখেছেন—১৮৩০ সাল। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি ছিলুম। প্রায় পাঁচশত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রচুর অর্থ দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল।

ইংরেজি সংবাদপত্র 'জন বুল' দুঃখ প্রকাশ করলেন—ভাবা গিয়েছিল রামমোহন খ্রিস্টধর্ম প্রচার করবেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রচারে মেতে গেলেন।

বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম বললেন, বেদের অভ্রান্ততা তিনি বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ। খ্রিস্টধর্ম ও গসপেলও বিশ্বাস করেন না।

ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। উপাস্য কে? ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সৃষ্টিরক্ষাকারী, অনাদি, অনন্ত, অগণ্য, অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বর। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে।

উপাসক কে? যে-কোনো ব্যক্তি সকলের জন্যেই উপাসনা মন্দিরের দ্বার খোলা। কোনো জাতিভেদ নেই। স্ট্যাটাস নেই। একমাত্র লক্ষ-উপাসনা।

উপাসনা প্রণালী? কোনো প্রকার ছবি, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি ব্যবহৃত হবে না। নৈবেদ্য, বলিদান, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। উপাসনা মন্দিরে পানাহার চলবে না। ব্যক্তি বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বক্তৃতা ও সঙ্গীতে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ঘৃণা প্রকাশ নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা। প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার বিকাশ। ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করা। সমস্ত উপদেশ, বক্তৃতা আর সঙ্গীতের এই উদ্দেশ্য।

রামমোহনের পরিষ্কার ঘোষণা, 'ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস, সার্বভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদ্যনন্ত পরব্রহ্মের পূজা কর।

'আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন'।। উপনিষদ

'বিশ্বব্যাপী মৈত্রী'।। বুদ্ধদেব

'পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য'।। যীশু
'ভক্তিতেই মুক্তি'।। শ্রীচৈতন্য
'একমাত্র ঈশ্বরের পূজা'।। মহম্মদ
'আপনাকে আপনি জান'।। সক্রেটিস
'মানব প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি'।। থিওডোর পার্কার
'সার্বভৌমিক উপাসনা'।। রামমোহন

'কলিকাতা বিভাগে' তখন কি কি জেলা ছিল? বর্ধমান, হুগলি, যশোহর, জঙ্গলমহল, মেদিনীপুর, নৌগং, নদীয়া, কলকাতার উপনগরসমূহ, চব্বিশ পরগনা, বারাসত, কটক, খুরদা, পুরী, বালেশ্বর।

ঢাকা বিভাগে ছিল, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা নগর, ঢাকাজেলালপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা। মুর্শিদাবাদ বিভাগে ছিল—বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ নগর, রংপুর, পূর্ণিয়া, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুরের কমিশনার, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান। পাটনা বিভাগে ছিল, বেহার, পাটনা, গোরক্ষপুর, রামগড়, সারন, সাহাবাদ, ত্রিহুত। বেরিলি বিভাগে ছিল, আরা, আলিগড়, বেরিলি, পিল্লিভীত, সাজিহানপুর, কানপুর, বিঠুর, ইটোয়া, ইটোয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফরেক্কাবাদ, সিরুরা, মুরাদাবাদ, লগ্‌গনা, মিরট, বুলন্দসহর, বেলাল, মজফরপুর, সাহরনপুর। বারাণসী বিভাগে, এলাহাবাদ, বিঠুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ডের উত্তর বিভাগ দক্ষিণ বিভাগ, বারাণসী, গাজিপুর, গাজিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, জৌনপুর, আজিমগড়, মৃজাপুর।

বেঙ্গল গবর্নমেন্টের কাছে পুলিস রিপোর্ট। সাল, ১৮২৩। মোট ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা হয়েছিলে। জাতিগত বিভাগ, ব্রাহ্মণ ২৩৪, ক্ষত্রিয় ৩৫, বৈশ্য ১৪, শূদ্র ২৯২। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ৩৪০ জন কলকাতা কোর্ট অব সারকিটের সীমার মধ্যে সহমৃতা হয়েছিলেন। এই সংখ্যা কেবল বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির। সারা দেশের সংখ্যা থাকলে আঁতকে উঠতে হত। এইবার যাঁরা সহমরণে গিয়েছিলেন, তাঁদের বয়েস। ১০৯ জন ষাট বছরের অধিক বয়স্কা। ২২৬ জন চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। ২০৮ জন কুড়ি থেকে চল্লিশ। ৩২ জন কুড়ি বছরের তলায়। রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব বিলেতের এক বক্তৃতায় বললেন, 'আমি নিশ্চয় করে বলছি, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য স্থাপন অবধি, গবর্নমেন্ট ও তাঁর কর্মচারীদের চোখের সামনে প্রতিদিন অন্তত এইরকম দুটি হত্যাকাণ্ড দিবালোকে সংঘটিত হত, আর প্রতি

বছর অন্তত ৫/৬ শো অনাথা রমণীকে এই ভাবে হত্যা করা হত।

পাদরিরা সতীদাহর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতেন না, কারণ সরকার যখন নীরব তখন দেশাচারকে মানতেই হবে। সতীদাহের বিরুদ্ধে বলা মানে সরকারের বিরুদ্ধে বলা। ডাক্তার জনস প্রতিবাদ করায় ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

জনৈক ইংরেজ, জে, পেগস একটি বই প্রকাশ করলেন, ১৮২৮ সালের ৯ মার্চ, The Suttee's Cry to Britain. বলপ্রয়োগ করে চিতায় পুড়িয়ে মারার বহু করুণ ঘটনা বইটিতে আছে। সবই প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। এরপর এক ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা ফ্যানি পার্কস প্রকাশ করলেন, Wanderings of a pilgrim in search of the picturesque during four and twenty years in the east with Revelations of life in the Zenana. বলপূর্বক সতীদাহের কয়েকটি বীভৎস ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন।

১৮৩০, ৭ নভেম্বর কানপুর। এক ধনী ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর স্ত্রী সতী হওয়ার জন্যে প্রস্তুত। গঙ্গার তীরে চিতা প্রস্তুত। বিশাল দর্শক। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উপস্থিত। বলপ্রয়োগ যেন না হয়। একজন সিপাহী খোলা তরোয়াল হাতে চিতার পাশে। সতী উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজেই চিতা প্রজ্বলিত করলেন। তারপর স্বামীর মাথা নিজের কোলে নিয়ে চিতায় বসলেন। চিৎকারে গগন ফাটছে, 'রাম নাম সত্য হ্যায়'। লকলকে আগুন। সেই তাপ সহ্য করতে না পেরে সতী গঙ্গায় ঝাঁপ মারেন আর কি! সিপাহী কর্তব্য ভুলে অভ্যাসবশত তরোয়াল দিয়ে কাটতে যায় আর কি। সতী ভয়ে জড়সড় হয়ে আবার চিতায় প্রবেশ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিরক্ত হয়ে সিপাহিকে সেখান থেকে সরিয়ে কয়েদ করে রাখলেন। আগুন আরো বাড়ল। এইবার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সতী ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গায়। সমবেত দর্শক ও সতীর আত্মীয়-স্বজনরা চিৎকার করতে লাগলেন, ধরে এনে চিতায় ফেলে দিয়ে বাঁশ দিয়ে চেপে ধর। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাধা দিলেন। সতীকে সঙ্গে সঙ্গে পালকিতে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হল।

ফ্যানি পার্কস অনুরূপ ঘটনা কলকাতাতেও ঘটতে দেখেছেন। সে বর্ণনাও আছে। গভর্নর জেনারেল সতীদাহ সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছিলেন। ১। বলপ্রয়োগ চলবে না, ২। মাদক দ্রব্য খাওয়ান যাবে না, ৩। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সতীর যে-বয়েস বেঁধে দেওয়া আছে তা মানতে হবে। ৪। গর্ভে সন্তান থাকলে সতী করা যাবে না।

গোঁড়া হিন্দুরা এই সব বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার জন্যে আবেদন করলেন।

পালটা আবেদন এল, বিধিনিষেধ যেন বলবৎ থাকে। বিত্তলোভেই পরিবার পরিজন বিধবাদের পুড়িয়ে মারে। দড়ি দিয়ে চিতায় বেঁধে, বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা হয়। যদি পালিয়ে যায় ধরে এনে চিতার আগুনে ফেলা হয়। .. have been forced upon the pile and there bound down with ropes, and pressed by green bamboos until consumed by the flames. All these instances, your petitioners humbly Submit, are murders, according to every Shastra, as well as to the common sense of all nations. এই শাস্ত্রীয় হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুন।

এই দ্বিতীয় পত্রটি রামমোহন রায়ের এবং তাঁর সহযোগীদের। বিধবানারীর ভীষণ হত্যাকাণ্ড। রামমোহন একাধিক বই প্রকাশ করলেন। দুটি বই 'নিবর্তক' ও 'প্রবর্তক', এই দুই ব্যক্তির কথোপকথন। 'সংবাদ কৌমুদীতে' রামমোহন একটি সতীদাহের বিবরণ লিখেছিলেন। কলকাতার ঘটনা। দুই সাহেব, একজন ইউরোপীয়, আর একজন আমেরিকান, সেই মহিলাকে চিতা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই প্রবন্ধে মঙ্গলঘাটের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সতী চিতা থেকে পালিয়ে গেছেন। তাঁর আর কোনো খোঁজ নেই।

শুধু লেখা নয়, আবেদন-নিবেদন নয়, রামমোহন সতীদাহের সংবাদ পেলেই শ্মশানে ছুটে যেতেন। সতী ও তাঁর পরিবারবর্গকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। একটি ঘটনা—বীরনৃসিংহ মল্লিকের পরিবারের কোনও এক রমণী সতী হবেন। গঙ্গার তীরে শ্মশানে সবাই সমবেত। রামমোহন খবর পেয়েই শ্মশানে হাজির হলেন। বধূটি যাতে সহমরণে না যান, পরিবারবর্গকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা রামমোহনের কোনো কথাই শুনলেন না। বিরক্ত হলেন। রেগে গিয়ে অপমানজনক কথা বলতে লাগলেন। ধীর-স্থির রামমোহন মান-অপমানে বিচলিত হতেন না। তর্ক-বিতর্কে মেজাজ হারাতেন না। তাঁরা রামমোহনকে মুখের ওপর বললেন, 'হিন্দুর কাজে মুসলমানের নাক গলান কেন?'

রামমোহন শান্ত, ধীর। তাঁর সঙ্গী রামরত্ন ভীষণ রেগে গেলেন। রামমোহন তাঁকে শান্ত করলেন। এর পরে খবর পেলেন কালীঘাটে কয়েকজন নারী সহমৃতা হবেন। রামমোহন ছুটে গেলেন। নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্ল্যাটফর্ম হয়েছিল 'সংবাদ কৌমুদী'। ১৮৩০ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত হল, রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব।' প্রচারিত হল ইংরেজি অনুবাদ। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ লড আমহার্স্টের শাসনকাল। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সতীদাহ বিষয়ক একটি আইন প্রণীত হল।

হ্যামিলটন আর বেলি সতীদাহ রদের পক্ষপাতী। আইন দেখে বেলি সাহেব বললেন, এ আইনে কোনো কাজ হবে না। কলকাতা অর্থাৎ রাজধানীর কাছেই এ বছর (১৮২৭) সতীদাহের সংখ্যা ৬৩৯।

বেলির মন্তব্য পড়ে ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভাপতি কম্বারমিয়ার লিখলেন, 'বেলিসাহেবের মত আমি সমর্থন করি। যে-ভাবেই হোক এই প্রথা বন্ধ করতে হবে।

লর্ড আমহার্স্ট বললেন, 'সতীদাহ একেবারে রদ করায় আমার মত নেই।' তিনি চলে গেলেন। এল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাল। একশ পাতার একটি বই প্রকাশিত হল সতীদাহের সমর্থনে। অঙ্গীরা, পরাশর, হারিত প্রমুখের বচন সম্বলিত। রামমোহন তাঁর যুক্তির অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিরাট বিতর্ক। বঙ্গের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মানুষ এই নৃশংস প্রথার বিরোধী। অবিলম্বে একটা কিছু করা হোক, তা না হলে শাসক ইংরেজদের মান থাকে না।

গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের এডিকং একদিন সকালে রামমোহন রায়ের বাড়িতে এসে জানালেন, 'লাটসাহেব আপনাকে ডেকেছেন।'

রামমোহন বললেন, 'আমি বৈষয়িক কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। শাস্ত্রচর্চা, ধর্মানুশীলন, এই সব নিয়েই আছি। আপনি অনুগ্রহ করে লাটসাহেবকে জানাবেন যে, রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা আমার আর নেই।'

লাটসাহেব এডিকংকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী বলেছিলেন?'

'আমি বলেছিলুম, গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে আপনি একবার সাক্ষাৎ করলে তিনি বাধিত হবেন।'

বেন্টিঙ্ক বললেন, 'আপনি আবার তাঁর কাছে যান। গিয়ে বলুন, মিস্টার উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে অনুগ্রহপূর্বক আপনি সাক্ষাৎ করলে তিনি বাধিত হবেন।'

এডিকং আবার এলেন। ঠিক ওই কথাই বললেন।

এই আগ্রহ, এই শিষ্টাচার রামমোহন উপেক্ষা করতে পারলেন না। দেখা করলেন। এই সাক্ষাৎকার ইতিহাসে একটি 'মণিকাঞ্চন যোগ'।

বেন্টিঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন, 'সতীদাহ সম্পর্কে আপনার কী মত? হিন্দু পণ্ডিতরা এত শাস্ত্র দেখাচ্ছেন।'

রামমোহন স্পষ্ট বললেন, শাস্ত্র ভগবানের তৈরি নয়। মানুষই শাস্ত্র-বিধি তৈরি করেছে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। আমি অনেক অনুসন্ধান করে স্থির নিশ্চিত

হয়েছি, বিধবার সম্পত্তি থাকলে তাকে ছলে, বলে, কৌশলে চিতায় তুলে সহমরণ, সতী, অক্ষয় পুণ্য ইত্যাদি লোভ দেখিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে। স্বার্থপর লোভী আত্মীয়-স্বজনরা ততোধিক লোভী ব্রাহ্মণদের উৎকোচ দিয়ে এই খুন করে। স্বামীর মৃত্যুতে তার বিধবা যখন শোকাহত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য তখনই এই অর্থলোভী, হীন ব্রাহ্মণদের এগিয়ে দেওয়া হয় সম্পত্তি আদায়ের জন্যে। বিধবাটিকে অনাহারে রাখা হয় যাতে শোক আর অনাহারে তার মস্তিষ্ক কর্মক্ষমতা হারিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে চলে যায়। নিজের বিচার, বিবেচনা যেন কাজ করতে না পারে। একটা শূন্যতা। এর ওপর সুকৌশলে তাকে ভাং খাওয়ান হয়। নেশার ঘোরে বলে, আমি সতী হব।

১৮২৯ সাল, ডিসেম্বর মাস, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন বলে ভারত ভূমি থেকে সতীদাহ রদ করে দিলেন। শীতের কলকাতা, ইংরেজের কলকাতা, কদিন পরেই বড়দিন। কলকাতায় হই হই ব্যাপার। গোঁড়া হিন্দু সমর্থকরা বলতে লাগলেন, ঘোর কলি। রামমোহন ব্যাটাকে মেরে ফেল।

সরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ি খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল
ও শালা জেতের দফা করলে রফা
মজালে মোদের তিন কুল।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখে ফেললেন —

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

১৮৩০, ১৬ জানুয়ারি রামমোহন রায় টাউন হলে সভা ডাকলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানানো হবে। একটি অভিনন্দন পত্র তৈরি হল। দুটি ভাষায়—বাংলা ও ইংরেজি। তিনশো নাগরিক সই করলেন। বাবু দ্বারকানাথ, জমিদার বাবু কালীনাথ রায় (টাকী), জমিদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনীপাড়া), তিন চারজন এই রকম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া, আর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অভিনন্দন পত্রে সই দিলেন না।

১৬ জানুয়ারি বড়লাটের কাছে দুটি অভিনন্দন পত্র পৌঁছল একটিতে স্বাক্ষর

করলেন কলকাতার তিনশো জন দেশীয় ব্যক্তি। অপরটিতে স্বাক্ষর করলেন আটশো জন খ্রিস্টিয়।

অভিনন্দনপত্রের শেষ অনুচ্ছেদটি বড় সুন্দর। 'যাঁহারা আপনার প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছেন, অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারবশতঃ এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপ সাধারণ কার্যে যোগ দেন নাই আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

অভিনন্দন পত্র বাংলাতেই লেখা হয়েছিল, ইংরেজিটি অনুবাদ। সভায় মুন্সী কালীনাথ রায় প্রথমে বাংলাটি পড়লেন। পরে পড়া হল ইংরেজি অনুবাদ। দুটিই প্রকাশিত হল সরকারী গেজেটে। সেই সময় হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ক্লাসে বসে তাঁরা আলোচনা করছেন, প্রায় তর্ক, অভিনন্দন পত্রের ইংরেজি রচনা রামমোহন রায়ের, না তাঁর বন্ধু অ্যাডাম সাহেবের। ঘোর তর্ক। এমন সময়ে ডিরোজিও সাহেব ক্লাসে এলেন। তর্ক শুনে তিনি বললেন, 'তোমরা মানুষ, না এই ঘরের দেয়াল! নারী হত্যার মতো ভীষণ একটা প্রথা দেশ থেকে উঠে গেল, কোথায় তোমরা আনন্দ করবে, না অভিনন্দন পত্রের ইংরিজি কার, এই বৃথা তর্কে মত্ত। রামমোহন রায় ইংরেজিতে কতটা সুপণ্ডিত জানলে অ্যাডামসাহেবের কথা তুলতে না।

লর্ড বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানাবার ঠিক পরের দিন, ১৭ জানুয়ারি বিরোধী দল একটি সভা আহ্বান করলেন। সভায় স্থির হল তাঁরা ইংল্যান্ডে দরবার করবেন। প্রিভি কাউনসিলে আপিল যাবে। দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব। ব্রাহ্মসমাজের মতো তাঁরাও একটি বিরোধী মঞ্চ গঠন করলেন। নাম হল 'ধর্মসভা'।

রামমোহন গৃহবন্দী থাকার মানুষ নন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা সাবধান করলেন, আপনি যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারেন। বিরোধীরা সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলছে। স্কুলে স্কুলে গিয়ে অপপ্রচার করছে। স্কুল বালকদের শেখানো হচ্ছে, আপনাকে দেখলেই তারা যেন বেড়াল, কুকুরের মতো শব্দ করে। ইট, কাদা, পাঁক ছোঁড়ে। আর ঘাতক বাহিনী তো তৈরিই আছে।

রামমোহন একা। কথায় তিনি বিদ্ধ হন না। মান-অপমান তাঁকে স্পর্শ করে না। আর আততায়ী? রোজ ভীমের মুগুর ভাঁজেন। গোটা-দশেককে ছুড়ে নর্দমায় ফেলে দিতে পারেন। সঙ্গে প্রহরী নয়, বুকের কাছে, পোশাকের আড়ালে একটি কিরিচ রাখতেন, অর্থাৎ মুখ বাঁকা ধারাল একটি ছুরি।

চতুর্দিক থেকে আঘাত। সবচেয়ে বড় আঘাত তাঁর মায়ের দিক থেকে।

'তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না। আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না তুমি।' এই খানেই শেষ নয়। পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে মামলা।

জগমোহনের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদকে দিয়ে তারিণীদেবী সুপ্রিমকোর্টে মামলা তুললেন পুত্র রামমোহনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন চলল। মামলা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল না। গোবিন্দ প্রসাদ হেরে গেলেন। খরচা-সহ মামলা ডিসমিস। মামলার শেষের দিকে নিশ্চিত হার জেনে গোবিন্দপ্রসাদ মার্জনা চেয়ে রামমোহনকে একটি চিঠি লিখলেন।

গোবিন্দপ্রসাদ মোটেই অনুতপ্ত হননি। অল্পদিন পরেই তাঁর মা দুর্গাদেবীকে দিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে আবার মামলা করালেন। এই মিথ্যা মামলায় আবার তাঁরা হারলেন।

রামমোহনের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা দীর্ঘ আট বছর চলেছিল। এই মামলাটি করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদ। এটি প্রতিশোধমূলক। রামমোহন তাঁর ভাগনে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে ভীষণ স্নেহ করতেন। গুরুদাস তাঁর প্রথম শিষ্য। তেজচাঁদ তাঁর মৃত পুত্র প্রতাপচাঁদের বিধবা পত্নীদের স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। গুরুদাস ওই বিধবাদের দেওয়ান ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি ওই বিধবাদের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। সেই রাগে তেজচাঁদের এই মামলা। তেজচাঁদের দাবি, রামমোহনের পিতা বকেয়া খাজনা বাবদ ৭৫০১ টাকার একটি ঋণপত্র লিখে দিয়েছিলেন ১৭৯৯ সালে। ঋণ তিনি শোধ করে যাননি। সুদে আসলে পাওনা টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫০০২ টাকা।

এই মামলাতেও রামমোহন জিতলেন। এর পরের সাংঘাতিক মামলা পুত্র রাধাপ্রসাদের নামে। রাধাপ্রসাদ বর্ধমানের কালেক্টরিতে নায়েব সেরেস্তাদের চাকরি করতেন। সরকারি তহবিল তছরুপের অভিযোগ। এটিও তেজচাঁদের কেরামতি। কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের হাত করে মামলা করিয়েছিলেন। রামমোহন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। এই মামলা রামমোহনের জীবনে এক বিপর্যয়। পারিবারিক জীবন তাঁর সুখের ছিল না। মাতা তারিণীদেবী সমস্ত ত্যাগ করে নিঃসম্বল, নিঃসহায় হয়ে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছেন, সম্পূর্ণ একা। বৃদ্ধার এমনই মনের জোর। সেখানে দাসীর মতো প্রতিদিন শ্রীমন্দিরে ঝাড়ু দেন! সেইখানেই তাঁর মৃত্যু। বিদায়ের আগে রামমোহনকে বৃদ্ধা জানিয়েছিলেন, 'রামমোহন! তোমার মতই ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা, অনেক বয়েস। চিরকাল যে সব পূজা করে সুখ পেয়েছি, তা ছাড়ি কি করে!'

তাঁর ধর্মীয় মতামত স্ত্রীরা মেনে নিতে পারেননি। পুত্ররাও অনুগত নন। রামমোহন কিন্তু স্নেহশীল পিতা, অনুগত স্বামী, কর্তব্যপরায়ণ। রাধাপ্রসাদের হেনস্তা রামমোহনের পক্ষে মর্মান্তিক। এই আঘাতে রাধাপ্রসাদের মা মারা গেলেন। টানা দু'বছর এই মামলা চলল। রাধাপ্রসাদ সসম্মানে মুক্তি পেলেন।

রামমোহনের দেহ দুর্গ ভাঙছে, আঘাতে আঘাতে, তবে বজ্রাদপি কঠিন মন অবিচল। সংস্কারের পথে আরও দূর যেতে হবে। নারী শিক্ষা, স্বাধীনতা, মুক্তি। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। বিধবা-বিবাহের প্রচলন। দামামা যখন বেজেছে, বন্ধ করা চলবে না। কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি চাই। দেশের বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হোক। শহরের মানুষের নৈতিক মান বিপন্ন। ইংরেজ সরকার যোগ্য ব্যক্তিকে পদে নিয়োগ করুন। পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু রাখুন।

কন্যাপণ বা কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এ কেমন প্রথা, টাকার লোভে বৃদ্ধ, রুগ্ণ ব্যক্তিকে কন্যা সমর্পণ। ভারতের অনিষ্টের মূলে জাতিভেদ। জাতিভেদ প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। সংস্কৃতে মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্যের একটি বই আছে 'বজ্রসূচি'। অখণ্ডনীয় যুক্তি—জাতিভেদ অযৌক্তিক। রামমোহন প্রথম অধ্যায়টি অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন।

শেষ পর্যন্ত রামমোহন সশস্ত্র দেহরক্ষী রাখতে বাধ্য হলেন। তাঁর শত্রুরা অতিশয় তৎপর। বাড়ির দেওয়াল ফুটো করে ভেতরের কাজ ও চালচলন সবই লক্ষ্য করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রামমোহনের বাড়ির ভেতর এমন কিছু আবিষ্কার করা যাতে তাঁকে সমাজচ্যুত করা যায়। ইতিমধ্যে তাঁর ওপর দুবার আক্রমণও হয়ে গেছে। কলকাতার গুণ্ডারা পেছন পেছন ঘুরছে।

রামমোহনের সহকারী মন্টগোমারি মার্টিন রামমোহনের বাড়িতে এসেই রইলেন। আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে বন্দুক, বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র বাড়িতে মজুত করলেন। রামমোহন বাইরে বেরলে তিনি পাশে পাশে থাকতেন। সঙ্গে তরোয়াল, পিস্তল। আরো কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী থাকতেন। ১৮৭১ সালে রামমোহন জন ডিগবিকে লিখেছিলেন, you may depend upon my setting off for England within a short period of time.

বারো বছর পরে সেই সুযোগ এল। ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু দিল্লীর মসনদে নামে মাত্র একজন মুঘল বাদশাহ বসে আছেন দ্বিতীয় আকবর শাহ্। কোম্পানির বৃত্তিভোগী। সেই বৃত্তির পরিমাণ সন্ধির চুক্তি ও বাদশাহের প্রয়োজন অনুসারে হচ্ছিল না। বাদশাহের এই অভাব সেই সময়

কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল।

আকবর শাহ রামমোহনের কথা শুনে থাকবেন। রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, ইংরেজি ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল। বাদশাহ রামমোহনকে তাঁর 'এলচি' বা দূত হিসেবে ইংলন্ডেশ্বরের রাজসভায় পাঠাতে চাইলেন। রামমোহন দূত হিসাবে দরবারে বাদশাহের আর্জি নিবেদন করবেন। চুক্তি অনুসারে কেন তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে না, দ্বিতীয়ত, দিল্লীর কাছে একটি জমিদারিতে তাঁর ন্যায্য অধিকার কোর্ট অব ডিরেক্টার্সরা কেন মানছেন না!

দূতের পদমর্যাদা থাকা চাই। বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিলেন। দিল্লীতে এটি মোহর খোদাই করে রামমোহনকে পাঠালেন। উপাধি দেওয়া ক্ষমতা তাঁর ছিল। রামমোহন লর্ড বেন্টিঙ্ককে লিখলেন, 'দিল্লীর বাদসা মহম্মদ আকবর শাহ আমাকে গ্রেট বৃটেনের রাজসভায় দূতরূপে প্রেরণ করিবার জন্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ; এবং তাঁহার ভৃত্য বলিয়া উক্ত পদের সম্মানের জন্য আমাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। উপাধিজনিত সম্মান লাভে ব্যাকুল নহি বলিয়া, আমি এ পর্যন্ত বাদসা কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত সম্মান গ্রহণে বিরত ছিলাম।

'যাহা হউক, এ বিষয়ে দিল্লীর বাদ্‌সার অভিপ্রায় এই যে, আমি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন মহারাজার সভায়, তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া, তাঁহাদের রাজবংশের গৌরব রক্ষার জন্য, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, কর্মচারী বলিয়া এরূপ উপাধি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। বাদশাহ তজ্জন্য আমাকে উক্ত উপাধি প্রদান করিবার জন্যে একটি মোহর দিল্লীতে খোদিত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রেসিডেন্ট সর চার্লস মেটকাফের ২৬ জুনের রিপোর্টের সুপারিসে, গবর্নমেন্ট ধার্য করেন, যে, বাদশাহ তাঁহার নিজের ভৃত্যদিগকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন।'

রামমোহন জানতে চাইলেন, তাঁর 'রাজা' উপাধি গ্রহণে বড়লাটের কোনো আপত্তি আছে কি না। ইংরেজ সরকার সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, দূত ও 'রাজা' বলে মেনে নিতে আপত্তি আছে। রামমোহন বড়লাটকে জানালেন, 'আমি বেসরকারি ব্যক্তি রূপেই ইংল্যান্ডে যাব। আমার কোনো তক্‌মার প্রয়োজন নেই।

ইংল্যান্ড যাওয়ার জন্যে বাদশাহ তাঁকে সত্তর হাজার টাকা দিলেন। দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন, অতিরিক্ত আট লক্ষ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে রামমোহন চার লক্ষ টাকা পাবেন। আর পাবেন পাঁচ হাজার টাকা মাসোহারা।

পাঁচ

১৮৩০ সাল, ১৫ নভেম্বর, সোমবার

'আলবিয়ান' জাহাজ কলকাতা বন্দর ছাড়ল। মধ্যসকালে। রাজার সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁর পালিত পুত্র রাজারাম। একজন ব্রাহ্মণ পাচক রামরতন মুখোপাধ্যায়, ভৃত্য রামহরি দাস, মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্‌স। রামহরি ছিলেন তাঁর খাস মুনশি। কয়েকজন ইংরেজ সহকারী ও বন্ধুও তাঁর অনুগামী হলেন। রোজ বারো সের দুধের প্রয়োজন। সঙ্গে দুগ্ধবতী দুটি গাভী নিলেন।

রাজারাম ছেলেটি কে। দুষ্ট লোকের রটনা, রাজারাম তাঁর মুসলমান রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। রাজারামের প্রকৃত পরিচয় ; সিবিলিয়ান ডিক হরিদ্বারের মেলায় একটি অনাথ পরিত্যক্ত বালককে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন। সাহেবের বিলেতে ফিরে যাওয়ার আদেশ হল। তিনি রামমোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, বালকটির কী হবে? রামমোহন সাহেবকে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই ; আমি আছি। রামমোহন রাজারামকে প্রতিপালনের জন্যে গ্রহণ করলেন। রামমোহন তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'যখন আমি দেখলাম, যে একজন খ্রিস্টিয়ান ইংরেজ একটি দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্যে এত যত্ন করছেন, তখন আমি দেশের লোক হয়ে তাকে আশ্রয় দিতে, তার ভরণপোষণের ভার নিতে কেমন করে অস্বীকার করতে পারি।'

ডিক সাহেব আর ভারতে ফিরলেন না। রামমোহন রায় বালকটিকে মানুষ করতে লাগলেন। পুত্র নির্বিশেষে স্নেহ করতেন। এত ভালবাসতেন, অনেকে মনে করতেন, 'আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে।' রাজারাম কোনো রকমের উৎপাত করলে রামমোহন তাকে শাসন করতে পারতেন না। রামমোহন কখনও কখনও অতিরিক্ত শ্রান্তি দূর করার জন্যে বিশ্রাম করতেন। বিশ্রামের ধরনটি ছিল অদ্ভুত—আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকতেন। এমন সময় কোনও কোনও দিন রাজারাম ঘরে ঢুকে এক লাফে রামমোহনের বুকের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ত। আচমকা। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ। রামমোহন কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে রাজারামের পিঠে আদরের চাপড় মারতেন, আর বলতেন, 'রাজা, রাজা'।

গুজব এই ভাবেই রটল, রাজারাম মুসলমানের ছেলে। হিন্দুরা রামমোহনের সঙ্গে আহার বিহার ত্যাগ করলেন।

বিলেত যাওয়ার সময় রামমোহন নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহযাত্রীদের নাম বদলে দিয়েছিলেন। রামরতনের পূর্বনাম ছিল শম্ভু, আর রামহরিদাসের পূর্ব নাম হরিদাস।

সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাচক। তিনি রামমোহনের আহার প্রস্তুত করবেন। আলাদা কোনো রান্নাঘর নেই। একটিমাত্র মাটির উনুন। মহা অসুবিধা। যাত্রীদের খানাঘরে রামমোহন আহার করতেন না। তিনি কেবিনেই আহার সারতেন। খাবার ঘরে আহার শেষ হলে, খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করে যখন ফল পরিবেশিত হত তখন সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে টেবিলে এসে বসতেন। সদা হাস্যমুখ, প্রসন্ন। সুপণ্ডিত। তাঁর আলোচনায় সকলে মুগ্ধ হতেন। জাহাজের সমস্ত মানুষের তিনি শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলেন। জাহাজের খালাসীরা পর্যন্ত তাঁর সেবা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

সময়ের আরোহী হয়ে আর ছ বছর পরে হুগলি জেলার অজ গাঁ কামারপুকুরে একজন আসবেন। সেখান থেকে আসবেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। বাগবাজারে হবে তাঁর 'কলকাতার কেল্লা', পরম বৈষ্ণব বলরাম বসুর বাড়িতে। কোম্পানির অধিকার তখন বৃটিশ এম্পায়ার। ইংরেজ শাসনের মহাদাপট। আরবি ফারসি ছেড়ে সব ইংরেজি শেখায় ব্যস্ত। ইংরেজের চাকে ভ্যান ভ্যান করছে বাঙালি মাছি। পাঠশালা থেকে শুভঙ্করী বিতাড়িত। বাংলা কথামালা অবহেলিত। সুর করে ছেলেরা পড়ছে।

পম্‌কিন লাউ কুমড়া, কোকোম্বার শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাষা।।

মনিব ইংরেজ, সরকার বাঙালি। ঈশ্বরের কৃপা। সে চুলোয় যাক। মনিবের কৃপা। সরকার হাত কচলাচ্ছে আর বলছে, 'ইফ মাস্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কাউ ডাই, মাই ব্ল্যাক স্টোন ডাই (শালগ্রাম), মাই ফোর্টিন জেনারেসান ডাই।'

সায়েব মনিব জিজ্ঞেস করছেন, 'কাল কেন আইস নাই?'

সায়েবকে বোঝাতে হবে, সায়েব কাল রথ ছিল। বাঙালি সরকার ভেবে

আকুল, সায়েবকে রথ বোঝায় কি করে? ছোট খাট একটা চার্চের মতো দেখতে। চার্চ ত ইটের তৈরি! মাথা বুদ্ধি দিল, কাঠের চার্চ। বলতে লাগল, 'উডেন চার্চ, থ্রি স্টারিস হাই, গাড আলমাইটি সিট আপন, লাং লাং রোপ, থৌজণ্ড মেন ক্যাচ, পূল পূল পূল, রনাওয়ে রনাওয়ে, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।'

ইংরেজ প্রভুদের হাত ধরে বাঙালি ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়েছে। তরুণ কলেজি শিক্ষায় ইংরিজি ভাষা, ভাবধারায় সড়গড় হয়েছে। প্রায় সমকক্ষ হয়েছে। খানা আর মদ উন্নত সভ্যতার প্রতীক হয়েছে। সাকার, নিরাকার সব ধর্মই হাওয়া, ভোগবাদের হাওয়ায় সব উড়ে গেছে।

ব্রাহ্মসমাজ, যাবতীয় সংস্কার আন্দোলন দেবেন্দ্রনাথ হয়ে কেশবচন্দ্রে জোরদার হয়েছে। বাঙালি শিক্ষিতদের ফিরিঙ্গি হওয়া রুখেছে। বাঙলা দেশ নদীর দেশ। ভাঙনের দেশ। ব্রাহ্মসমাজও ভাঙবে। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ বেরিয়ে আসবেন নতুন সমাজে। ঠিক সেই সময় সব গিলে ফেলবেন দক্ষিণেশ্বরের নিরীহ যে ব্রাহ্মণটি। তিনিও এক আন্দোলন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। তৃণমূল থেকে গিরিশীর্ষ, ছাপোষা থেকে ডেপুটি, মেথর থেকে মহারাজ, শীতলা থেকে ব্রহ্ম, ভাগবত থেকে শঙ্করাচার্য সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি। রামমোহন যেটিকে একপেশে করে ফেলেছিলেন। সেইটিকে তিনি সোজা করে দেবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উক্তি—যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন।

উদাহরণ—রামমোহন।

যাঁদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে তাঁরই কেবিনে গড়াগড়ি। স্থানাভাবে রামমোহন একটি অপরিসর জায়গায় কোনোক্রমে স্থান করে নিলেন। কোনো বিরক্তি নেই, অভিযোগ নেই। সারাদিন সংস্কৃত আর হিব্রু পাঠ করতেন। মধ্যাহ্নের আগে আর সন্ধ্যার সময় ডেকের ওপর বায়ু সেবন করতেন। কখন কখন সহযাত্রীদের সঙ্গে মহা উৎসাহে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ঝড় উঠলে ডেকে দাঁড়িয়ে ঝড়ের শোভা দেখতেন। দিগন্ত প্রসারিত সুনীল সমুদ্র, বিশাল বিশাল ঢেউ-এর সফেন সংঘাত, গম্ভীর গর্জন। ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অটল এক ধ্যানমূর্তি। রাজকীয় পোশাকের প্রান্তভাগ বাতাসে ছটফট করছে।

ব্রহ্মলীন মানুষের স্থৈর্য। প্রায় পাঁচমাসের জন্যে জলে বাস। দীর্ঘ সময় জাহাজ বন্দী। প্রায়ই সমুদ্রের স্ফীত ঢেউ তাঁর কেবিন ভাসিয়ে দিত। জিনিসপত্র সব

ভেসে উঠত। এই বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হতেন না।

তখন সুয়েজখাল কাটা হয়নি। ইংল্যান্ডগামী জাহাজকে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত ঘুরে যেতে হত। জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছল। রামমোহন জাহাজ থেকে নামলেন। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে কেপকলোনি ঘুরে এলেন। এই সময় দুর্ভাগ্যজনক একটি দুর্ঘটনা ঘটল। জাহাজে ওঠার সময় গ্যাংওয়ে ল্যাডারটি ঠিকমতো লাগানো হয়নি, পা রাখামাত্রই রামমোহন পড়ে গেলেন। গুরুতর আঘাত পায়ে। পরবর্তী আঠারো মাস তাঁকে খুঁড়িয়ে চলতে হল।

নিজের মনকে তিনি এমন এক উচ্চভূমিতে তুলতে পেরেছিলেন যার ফলে শারীরিক ক্লেশ তাঁকে কাবু করতে পারল না। তাঁর একটিই উদ্বেগ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ গ্রহণের আগে জাহাজ যেন ইংলন্ডে পৌঁছয়।

ইতিমধ্যে দুটি ফরাসি জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়ল। স্বাধীন ফ্রানসের পতাকা পত পত করে উড়ছে। পরাধীনতার শত্রু রামমোহন উল্লাসে ফেটে পড়লেন। ফ্রান্স স্বাধীন হয়েছে। ফরাসি জাহাজে যাওয়ার জন্যে ব্যাগ্র হলেন। স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে যে। ভাঙা পা, হাঁটার অসুবিধে, আবার গ্যাংওয়ে! রামমোহন বললেন, 'আমি পারব।'

ফরাসিরা তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। দোভাষীর মাধ্যমে রামমোহন জানালেন, 'আপনাদের স্বাধীন পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। অপরিসীম আনন্দ। পার্থিব শক্তি নৈতিক শক্তির কাছে পরাজিত —Glory, glory, glory to France.'

রামমোহন অন্তরীপের যে হোটেলে কিছুক্ষণের জন্যে ছিলেন সেখানে বিশিষ্ট কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি দেখা করতে এসেছিলেন। রামমোহন তখন জাহাজে ফিরে এসেছেন। দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তাঁরা জাহাজে এসেছেন দেখা করবেন। রামমোহন দেখা করলেন। জাহাজ যত ইংল্যান্ডের কাছাকাছি হচ্ছে রামমোহনের উদ্বেগ তত বাড়ছে। বৃটিশ পার্লামেন্টে কী হচ্ছে, জানার জন্যে ব্যাকুল। জাহাজের কাপ্তেনকে অনুরোধ করলেন, ইংল্যান্ড থেকে কোনো জাহাজ আসতে দেখলে তিনি যেন তার আরোহীদের জিজ্ঞেস করেন পার্লামেন্ট সংবাদ।

বিষুবরেখার কাছাকাছি এসে একটি জাহাজ দেখা গেল। যাত্রীরা কয়েকটি সংবাদপত্র দিলেন। ইংল্যান্ডে মন্ত্রী বদল হয়েছে। ডিউক অব ওয়েলিংটনের জায়গায় এসেছেন লর্ড গ্রে। রামমোহন মহা খুশি। মন্ত্রিত্বের এই পরিবর্তনে আশা করা যায় ভারতের মঙ্গল হবে।

আর কয়েকদিন পরেই জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলে ঢুকবে। সেই সময় বহির্গামী একটি জাহাজের যাত্রীদের কাছে চারদিন আগের খবর পাওয়া গেল, পারলামেন্টে ভোটাভুটির জন্যে রিফরম বিল দ্বিতীয়বার পেশ করা হয়। বিরোধী রক্ষণশীল টোরি দল মাত্র একটি ভোট বেশি পেয়েছে। রামমোহনের আনন্দ, পরিণামে রিফরম্ বিল পাশ হতে বাধ্য। ইংল্যান্ডের মানুষ এই রিফরম্ বিল পাস হওয়ার আশায় রামমোহনের মতোই উদগ্রীব হয়ে আছেন।

চার মাস তেইশ দিনের যাত্রা অবশেষে বন্দর পেল। ১৮৩১, ৮ এপ্রিল। রামমোহন সদলে ইংল্যান্ডে অবতীর্ণ হলেন। মাথার ওপর লিভারপুলের বিদেশি আকাশ, বিদেশি বাতাস, বিদেশ ভূমি, সাদা সাদা মানুষ, অন্য ভাষা, পোশাক, আচার-আচরণ।

উইলিয়াম র‍্যাথবোন গ্রিনব্যাঙ্কে তাঁর বাড়িতে অতিথি হওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে থাকার জন্যে রামমোহন 'র‍্যাডলিস হোটেলে' উঠলেন। রামমোহন নিজেই কি জানতেন, তাঁর খ্যাতি সাগরপারেও পৌঁছে গেছে। পারলামেন্টে রিফর্ম বিল গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনায় ইংল্যান্ড আনন্দে উত্তাল। আর ঠিক সেই সময় প্রগতির দূত রামমোহন এসেছেন তাঁদের মধ্যে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমনে র‍্যাডলিস হোটেল সরগরম। আমন্ত্রণের পর আমন্ত্রণ আসছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রামমোহনের নিজের জন্যে সময় রইল না এতটুকু। একই সন্ধ্যায় ছ-সাত জায়গায় নিমন্ত্রণ। আলোচনার বিষয় হয় রাজনীতি, না হয় ধর্ম।

ইউনিটারিয়ান চ্যাপলে প্রকাশ্য জনসভায় প্রথম বক্তৃতা। রাজকীয় চেহারা, রাজকীয় পোশাক, মাথায় বহুমূল্য শালের পাগড়ি। সায়েবদের মতো ইংরিজিতে যুক্তি-তর্কের জাল বুনে চলেছেন। শ্রোতারা মন্ত্র-মুগ্ধ। কে এই ভারতীয়? রাজা রামমোহন। ভারতের আলো।

সভা শেষে শ্রোতারা ঘিরে ধরলেন। করমর্দনের পর করমর্দন। বিলাতবাসী অপেক্ষা করো, শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার তীর থেকে তীক্ষ্ণ আর একটি তীর আসবে পাশ্চাত্যের হৃদয় বিদ্ধ করতে।

ইউনিটারিয়ান চ্যাপেলের দেয়ালে একটি স্মারকলিপির ওপর চোখ পড়ল। রামমোহন এগিয়ে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখে জল। পরলোকগত বন্ধু মিঃ টেটের স্মৃতি।

এরপর রামমোহন গেলেন অ্যাংলিক্যান চার্চে। অদ্ভুত সমাবেশ। বহু মানুষ

তাঁর ভাষণ শুনতে এসেছেন! প্রথম বিস্ময় সাপ-খোপ, ভূত-প্রেত, চোর-বদমাইশের দেশ ভারত, সেই দেশের এক মানুষ ইংরেজদের মতো সুন্দর ইংরিজিতে ভাষণ দিচ্ছেন। শুধু তাই নয় যে কথা বলছেন তেমন কথা সহসা শোনা যায় না।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়ম রসকো তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। রামমোহনের লেখা তিনি পড়েছেন। দুজনের মধ্যে পত্রালাপ হত। রসকো পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। রামমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

লিভারপুলের বহু ধনী ব্যক্তির আমন্ত্রণ তাঁকে রক্ষা করতে হল। সকলেই অভিভূত। রামমোহনের জয়জয়কার। লিভারপুল থেকে লন্ডন। হাউস অব কমন্‌সে 'রিফর্ম বিল'-এর ওপর আলোচনা হবে। রামমোহন সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকতে চান। দ্রুত চলে এলেন লন্ডনে। পথে শিল্পশহর ম্যাঞ্চেস্টারে থামলেন। কারখানা দেখবেন। কারখানার শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষ রামমোহনকে দেখার জন্যে ছুটে এলেন। করমর্দন, আলিঙ্গন, ঠেলাঠেলি। পুলিস দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ। লন্ডনের পথে যেখানেই থামলেন সেখানে এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

লন্ডনে পৌঁছলেন রাত দশটায়। উঠলেন এডেল্‌ফি হোটেলে। আসার সংবাদ পেয়ে তাঁর বন্ধুরা সেই রাতেই ছুটে এলেন। সেই রাতের একটি ঘটনায় রামমোহন বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। এমন সমাদর তিনি আশা করেননি। ইংলন্ডের বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। সর্বজন শ্রদ্ধেয়। দীর্ঘকাল তিনি বাড়ির বাইরে বেরোন না। তিনিও সেই রাতে হোটেলে এসে রামমোহনকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

হোটেলে কয়েকদিন থাকার পর রামমোহন একটি বাড়ি ভাড়া করলেন। ঠিকানা ১২৫, রিজেন্ট স্ট্রিট। বেন্থাম সম্মান জানিয়ে গেছেন শুনে লন্ডনের বিশিষ্টজনেরা তাঁর বাড়িতে এসে ভিড় করতে লাগলেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে রামমোহনের দিন অতিবাহিত হচ্ছে। সবাই ভাবছেন, অসুস্থ না হয়ে পড়েন। শেষে অসুস্থই হলেন। তাঁর চিকিৎসকরা বাড়ির দারোয়ানকে বললেন। এখন দিন কতক অতিথিদের প্রবেশ নিষেধ।

এরপর বৃটিশ পারলামেন্টে রিফরম বিলের ওপর ডিবেট। বিলের পক্ষে প্রচার করা সত্ত্বেও বিরোধী টোরি পার্টির বহু বিশিষ্ট সদস্য রামমোহনকে বন্ধুর মতোই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রভাবেই বহু টোরি লর্ড ভারতীয় জুরি বিলের

বিরুদ্ধে ভোটও দিয়েছিলেন। ইংলন্ডে দলমত নির্বিশেষে তিনি সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রামমোহনকে মোগল বাদশাহের দূত হিসাবে স্বীকার করতে না চাইলেও ইংলন্ডের সরকার ও মন্ত্রীরা তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের জনসাধারণ তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 'ভারতের দূত' হিসাবে।

ইংলন্ডে রামমোহনের জনপ্রিয়তায়, সম্মাননায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মনোভাবও পালটাল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে রামমোহনকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান হল। ১৮৩২, ৬ জুলাই। ভোজে কোম্পানির চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান-সহ প্রায় আশিজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রামমোহন ইউরোপীয় খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলেন না। তিনি খেলেন কেবল ভাত আর জল।

হাউস অব কমন্‌স্ কোম্পানির নতুন সনদ সম্পর্কে তদন্ত ও বিবেচনার জন্যে একটি সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে রামমোহনকে আমন্ত্রণ জানানো হল। সিলেক্ট কমিটির সামনে উপস্থিত না হলেও পর পর কয়েকটি চিঠিতে তাঁর মতামত জানালেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্য তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন।

কোম্পানির ভারতে জমিদাররা সুখে আছেন, প্রজাদের অবস্থা? খাজনার দায়ে তাদের ভাত জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না। রামমোহন লিখলেন—Such is the melancholy condition of the agricultural labourers that it always gives me pain to allude to it, তিনি প্রতিকার জানালেন,

জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ কমান। তাতে প্রজাদের খাজনা কমবে। রাজস্ব হ্রাসের ফলে সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা বিলাস দ্রব্যের ওপর করবৃদ্ধি করে সহজেই তুলে নিতে পারবেন।

সরকারের ব্যয় কমাবার জন্যে বললেন :

বেশি-মাইনের ইউরোপীয় কর্মচারীদের পরিবর্তে কম মাইনের ভারতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ করুন। ইংলন্ডবাসী জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখলেন, যে কোনো উপায়ে ভারতের কৃষকদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। প্রজাদের সন্তোষই সরকারের শক্তি।

Questions and answers on the Judicial System of India,

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার। অভিজ্ঞ প্রস্তাব পেশ করলেন রামমোহন। ভারতের আদালতে আর ফারসি নয়, এইবার ইংরিজি। দেওয়ানি আদালতে 'অ্যাসেসার' পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হোক। পঞ্চায়েতী বিচার ব্যবস্থার অনুকরণে জুরির দ্বারা বিচারের প্রবর্তন।

জজ আর রেভেনিউ কমিশনার দুটি পৃথক পদ হোক। ভারতীয় ফৌজদারি আর দেওয়ানি আইনসমূহের বিধিবদ্ধ সংকলন।

আইন প্রণয়নের আগে বিশিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনা। রামমোহন বললেন, বুদ্ধিমান ভারতীয়দের আনুগত্য ও সহযোগিতা পেতে হলে যোগ্যতা আর দক্ষতা অনুসারে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ পদে তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮৩১, সেপ্টেম্বর। ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎকার। ইংলন্ডেশ্বর তাঁকে অভূতপূর্ব মর্যাদায় বরণ করলেন। এ এক বিরাট সম্মান। স্বপ্নাতীত। ইংল্যান্ডে রামমোহন এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি রাজা, রাজোচিত চালচলন। থাকেন রিজেন্ট পার্কে, কাম্বারল্যান্ড টেরেসের প্রাসাদে। নিজস্ব একটি ঘোড়ার গাড়ি। একজন কোচোয়ান ও ভৃত্য সেই গাড়িতে মোতায়েন।

অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ তাঁর আকর্ষণ। ইংরেজ অভিনেত্রী ফ্যানি ক্যাসল তাঁর গুণমুগ্ধ হলেন। রাজা প্রায়ই থিয়েটারে যেতেন। ভাল অভিনয় দেখলে আবেগে অশ্রুমোচন করতেন।

মানুষ জন্তু-জানোয়ার নয়। রাজা যদি প্রকৃত সুশাসক হতে চান তাহলে মানুষকে তার অধিকার দিতে হবে। সভ্য পৃথিবীর শাসন-ব্যবস্থা হওয়া উচিত সমাজতন্ত্র। ধর্মযুক্ত, ধর্ম বিযুক্ত নয়। ধর্ম ছাড়া মানুষের ধরন পালটাবে না। মানুষের কোয়ালিটি। রিফর্ম বিল নিয়ে মাতামাতির কারণ, ইংল্যান্ডের মানুষ যদি স্বাধীনতা, স্বাধিকার পায়, চিন্তার স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা, তাহলে ভারতের মানুষও উদার শাসনব্যবস্থা পাবে। রামমোহন এমনও বললেন, 'ইংল্যান্ডে এই বিল যদি পাস না হয়, তবে আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদন করব, আমার কোন আনুগত্য থাকবে না, ইংরেজের ভারত ছেড়ে অন্য কোনো স্বাধীন দেশে চলে যাব।'

রিফর্ম বিলের মূল কথা ভোটাধিকার সম্প্রসারণ। এটি হল প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারত কি চিরকাল পরাধীন থাকবে। রিফর্ম বিল পাস হয়ে যাওয়ার পর রামমোহন একটি চিঠিতে আনন্দ

প্রকাশ করে লিখলেন, The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their pursew at the expense, to may, to the ruin of the people, একদল নিজেদের ঝুলি ভরবে আর বাকি মানুষ উচ্ছন্নে যাবে, তা কি হয়।

বিপ্লবের জন্মভূমি ফ্রানসে যেতে চাই। আমি এক পথিক, আমার হৃদয়ে আছে ফরাসিরা, যারা স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে। বোর্ড অব কন্ট্রোলকে লিখলেন পাসপোর্টের জন্যে। ফ্রানসের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রিন্স তালিরাঁর কাছে অনুমতি চাইলেন। শুধু অনুমতি নয় পরিভ্রমণের জন্যে সাদর আমন্ত্রণ এল।

রামমোহন মহানন্দে প্যারিসে গেলেন। ফ্রানসের জনসাধারণ তাঁকে বিপুল সংবর্ধনায় অভিভূত করলেন। ফ্রানসের রাজা লুই ফিলিপও তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। রামমোহন কয়েক মাস রইলেন একজন ভদ্রলোকের কাছে ফরাসি ভাষা শিখলেন। ফিরলেন লন্ডনে।

মোগল বাদশাহের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। সে কথা ভোলেননি। রাজা ও সরকারের কাছ থেকে তিনি দূতের স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। রাজা চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পর সিংহাসন পেলেন চতুর্থ উইলিয়ম। রাজসভায় রামমোহনকে দূতের আসনই দেওয়া হয়েছিল। রামমোহন বাদশার হয়ে চতুর্থ জর্জকে যে আবেদন-পত্র পাঠিয়েছিলেন সেটি ছিল অনবদ্য যেমন ভাষা, সেইরকম যুক্তি-সমাবেশ, ভাবগাম্ভীর্য। তুলনাহীন এক নিবেদন। ইংল্যান্ডে পৌঁছেই রামমোহন রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে একটি চিঠি লিখলেন। মুঘল বাদশাহের যাবতীয় দাবি ছেপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গ ও ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে বিলি করে দিলেন। তারপর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তদবির চলল।

১৮৩৩, ১৩ ফ্রেবুয়ারি। কোম্পানির পরিচালক সভা বাদশাহের বৃত্তি কয়েকটি শর্তাধীনে বার্ষিক বারো লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ করার নির্দেশ দিলেন। বাদশার কাছে বার্তা পৌঁছল। তিনি জানালেন, রামমোহনের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোম্পানির এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রামমোহন জানালেন শর্তাধীন এই সামান্য বৃদ্ধি আপনি স্বীকার করবেন না। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

রামমোহনের দৌত্যের আংশিক সাফল্যে দেশীয় রাজারা উৎসাহ পেলেন। গোয়ালিয়ারের রাণী বাইজাবাঈ তাঁকেই দূত নিযুক্ত করতে চাইলেন।

এইবার রামমোহনের জীবনের প্রধান কাজ—সতীদাহের উচ্ছেদ সাধন। প্রিভি কাউন্‌সিলে আপিলের শুনানি। সতীদাহ সমর্থকরা 'ধর্মসভা' গঠন করে প্রথা বহাল রাখার জন্যে কাউনসিলে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদন নাকচ করাতে হবে। ধর্মসভার আবেদনের বিরুদ্ধে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি প্রতি-আবেদন তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। আবেদনটি তিনি হাউস অব কমন্‌সে পেশ করলেন।

হোয়াইট হলের কাউনসিল চেম্বারে প্রিভি কাউনসিলের শুনানি শুরু হল। সে এক বিরাট সভা। উপস্থিত হয়েছেন লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউনসিল, লর্ড চ্যান্সেলর, মাস্টার অব দি রোলস, কার্স্টে লর্ড অব দি অ্যাডমিরাল্‌টি, পে মাস্টার অব দি ফোর্সেস, মার্কুইস অব ওয়েলেসলি, মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন, লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড জন রাসেল, স্যার জেমস গ্রাহাম, স্যার এল, শ্যাডওয়েল আর স্যার ডাব্লিউ. এইচ. ইস্ট। এঁদের সঙ্গে বসেছেন রাজা রামমোহন।

প্রিভি কাউনসিল 'সতীদাহ' প্রথা বাতিল করে দিলেন। রামমোহনের সমস্ত স্বপ্ন একে একে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এদিকে শরীর ভাঙছে। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের যাদুতে বিলেত অভিভূত। এক রাজা এসেছেন, ভোগী নয় যোগী। জ্ঞানী, সুবক্তা। স্থির হয়ে স্থির দৃষ্টিতে যখন কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেন তখন মনে হয় অলৌকিক এক পুরুষের প্রস্তরমূর্তি।

রামমোহনের জনপ্রিয়তা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল! রেভারেন্ড ডসন তাঁর শিশুপুত্রের নাম রাখলেন 'রামমোহন রায়'।

রামমোহন লিখেছেন একটি চিঠিতে, অনেক তো হল, এইবার কিছুদিন সুন্দর কোনো জায়গায় বিশ্রাম। যে অতীত পেছনে ফেলে এসেছি, সেদিকে তাকালে দেখতে পাই, কেবলই সংঘাত। তখন হয়ত ষোল, পিতা আমার খাতায় পড়লেন, পুতুল পুজো আমি মানি না। আমাকে মানুষ করার জন্যে তিনি কি না করেছেন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে বিরোধিতার কারণে পরিবার-পরিজন আমাকে ত্যাগ করলেন, অথচ আমার এই পিতা এতটাই উদার ছিলেন, যে, তাঁর পিতার অন্তিম আদেশ শিরোধার্য করে, বৈষ্ণব হয়েও শাক্ত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করলেন। আমার মায়ের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটল। তিনি ঘোর শাক্ত থেকে অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হয়ে গেলেন। আমার দাদু ছেলেবেলায় আমার মুখে একটি পূজার বেলপাতা দিয়েছিলেন, প্রসাদী। মায়ের সে কি রাগ! সেই মা আমাকে তাঁর পাদস্পর্শ করতে দিতেন না। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে মামলা

করিয়েছিলেন। আমার বাবাকে, দাদাকে জেলে যেতে হল। আমার বউদিকে সতী হতে হল। আমার ছেলের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মামলা এল। এই অপমানে তার মা মারা গেলেন। সারা বাঙলার হিন্দুরা আমার সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী। দু দুবার আমাকে মারার চেষ্টা হল। এইবার আমি বিশ্রাম করব।

আরো দুর্যোগ বাকি ছিল। ইংল্যান্ডে আসার সময় টাকার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। কলকাতার বিলিতি ব্যাঙ্ক মেসার্স ম্যাকিন্টশ অ্যান্ড কোম্পানি লন্ডনে মেসার্স রিকার্ডস ম্যাকিন্টশ অ্যান্ড কোম্পানিকে টাকা পাঠাবেন। দুটো ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন। দুটি ব্যাঙ্কই ফেল করল। বিলেতে রামমোহন প্রায় কপর্দকশূন্য।

এই সময় তাঁর ইংরেজ সেক্রেটারি স্যান্ডফোর্ড আর্নট বাকি মাইনে বলে প্রচুর টাকা দাবি কবলেন। ভয় দেখালেন, টাকা না পেলে ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে রামমোহন যা লিখেছেন সব তাঁর লেখা বলে প্রচার করবেন। আর্নটের এই ব্যবহারে রামমোহন অবাক হয়ে গেলেন।

বিদেশে এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া পরিচালক-সভার কাছে আবেদন জানালেন। তাঁর ব্যক্তিগত জামিনে তাঁকে দু হাজার পাউন্ড ঋণ দেওয়া হোক। পরিচালক সভা আবেদন খারিজ করে দিলেন। রামমোহন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

আবার সেই রমণী! একদা গৃহত্যাগী, অসীম সাহসী, ষোড়শ বর্ষীয় রামমোহনকে তিব্বতে রক্ষা করেছিলেন তিব্বতী মায়েরা। বিলেতেও সেই একই ভূমিকায় নারীরা। কোম্পানি টাকা ধার দেবে না। আর্নট সমস্ত লেখা নিজের নামে চালাবেন, যদি না তাঁর চাহিদামতো বিরাট অঙ্কের অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়।

রামমোহন ব্রিস্টলে গেলেন। সঙ্গে তাঁর ভারতীয় বাহিনী, ভৃত্য রামহরি দাস, পাচক রামরতন মুখার্জি। রাজারাম প্রথম থেকেই ব্রিস্টলে। ব্রিস্টলে রামমোহনের বন্ধু ডঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার থাকেন। তিনি তাঁর তরুণী আত্মীয়া মিস্ ক্যাশ্‌লের অভিভাবিকা। স্টেপ্‌ল্‌টনে মিস্ ক্যাশ্‌লের একটি বাড়ি আছে। স্টেপল্‌টন গ্রোভ। বাড়ি নয় প্রাসাদ।

রামমোহন স্টেপলটন গ্রোভে এলেন। ডেভিড হেয়ারের বোন মিস হেয়ার তাঁকে নিয়ে এলেন। বন্ধু কার্পেন্টার মিড চ্যাপেলের ধর্মযাজক। রামমোহন

এখানে তাঁর দুই তরুণী মাতাকে খুঁজে পেলেন মিস হেয়ার, আর মিস ক্যাশ্‌ল।

এই মনোরম শান্ত পরিবেশে আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার সুন্দর স্বাস্থ্য আবার ফিরে পান। নারীর সেবা আর যত্ন, রামমোহন যা কখনো পাননি। তিনি ছিলেন গতি আর শক্তি। দীর্ঘ, সুঠাম দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। আর মুখমণ্ডল সদাসর্বদা রক্তাভ।

বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে ছিল না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আসছেন। সকলেরই প্রশ্ন, আপনার ধর্মটা কী? রামমোহনের স্বভাব, কারো মনে আঘাত দিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রশ্নকারী এই জেনে খুশি হতেন, তাঁর ধর্ম আর রামমোহনের ধর্ম এক।

এরই মাঝে দুটি রবিবার মিড চ্যাপেলে গেলেন বন্ধু কার্পেন্টারের ধর্মোপদেশ শুনতে। রামমোহনকেও বক্তৃতা দিতে হল দীর্ঘ সময় ধরে। বিলেতে রামমোহন তো একা নন, সচিব, খানসামা ছাড়াও দুটি গরু, আর সেই গরু দুটিকে দেখার জন্যে একটি লোক শেখ বকশ্‌। বালক রাজারামও এক দুশ্চিন্তা। ইংরেজ বন্ধুদের কাছে টাকা ধার চাইতে হয়েছে। রাজার মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বড় অস্বস্তির ব্যাপার। ইংরেজদের কাছে টাকাই জীবন। টাকা দেওয়া আর জীবন দেওয়া প্রায় এক।

কিন্তু কিছু বন্ধু তো ছায়ার মতো পাশে এসে দাঁড়ালেন, যেমন জন আর জোসেফ হেয়ার, তাঁদের বোন জেন, ডঃ কার্পেন্টার, মিস ক্যাসল, মিস কিডেল, মিস্টার এস্টলিন, দি মান্‌থলি রিপোজিটারির সম্পাদক রেভারেন্ড ডব্লু. জে. ফক্স।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, জ্বর এসেছে, মনে হচ্ছে লিভার। কয়েকদিন পরে তাঁর মনে হল, গোলমালটা মাথায়। অসম্ভব মস্তিষ্ক চালনা আর দুশ্চিন্তার ফল। রামমোহন চোখ চেয়ে ঘুমোচ্ছেন। মাথাও ধরছে। আরও কয়েকজন ডাক্তারে পরামর্শ নেওয়া হল। তাঁরা সমর্থন করলেন। একজন সেবিকার প্রয়োজন। জেন হেয়ার বললেন, আমি আছি।

কপালে জোঁক বসান হল। কোনো উন্নতি হল না। দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ। যতক্ষণ জেগে আছেন ততক্ষণ প্রার্থনা চলছে। মাঝে মাঝে বলছেন ওঁ।

সেই রাতটা ছিল ভারি সুন্দর। মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা। পরিপূর্ণ চাঁদের আলো। রামমোহনের বন্ধু, তাঁর সর্বক্ষণের চিকিৎসক লিখছেন সেই রাতের কথা। ১৮৩৩, ২৭ সেপ্টেম্বর।

'মিনিটে মিনিটে তাঁর অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে। গলা ঘড়ঘড় করছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নাড়ি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি অবিরাম তাঁর ডান হাতটা নাড়তে লাগলেন। বাঁ হাতও অল্প অল্প নড়ছিল। কি চাঁদের আলো আজ! খোলা জানলার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি, মিঃ হেয়ার, মিস্ কিডেল। বাইরে রাত্রির গ্রামাঞ্চলের প্রশান্ত দৃশ্য। মিস হেয়ার হতাশ ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন ; যখন আশা ছিল তখন তিনিই রাজাকে সেবা করতেন, খাওয়াতেন; কিন্তু এখন আর এই মুমূর্ষু রাজার ওপর নুয়ে পড়ে তাকাতেও সাহস পেলেন না। তিনি চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তরুণ রাজারাম পিতার বাঁ হাতটি ধরে বসেছিল। হতবাক। চোখে জল।' সময় হাঁটছে মাপা ছন্দে। বিলিতি আকাশে দিশি চাঁদ ক্রমশই পশ্চিমে ঢলছে। একটি মাত্র শব্দ ওঁ। রাজা চলে গেলেন অনন্তে। দুটো বেজে পঁচিশ মিনিট।

শেষ যে লেখাটি রাধাপ্রসাদকে ডাকে পাঠিয়েছিলেন,

'কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি,
দেশভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।'

'so passed the great Hindu মেঝেতে মাদুরে শায়িত হিন্দু যোদ্ধা। প্রশান্ত সমাহিত মূর্তি। বিষাদ আর বেদনা মাখা কবিতার মতো এই মৃত্যুর স্মৃতি ভারতের স্মৃতি মর্মরে চিরস্থায়ী হবে। ভারত থেকে দূরে, বহু দূরে, এক নির্জন বিদেশী গ্রামে, চাঁদমাখা রাতের শেষপ্রহরে, গুটি কয়েক মানুষের স্তব্ধ উপস্থিতিতে, তিনি চিরবিদায় নিলেন।

রাজা বলেছিলেন, খ্রিস্টান প্রথায় তাঁর শেষকৃত্য যেন না হয়। তাঁর চির শয়নের ভূমি পাওয়া যাবে কোথায়? স্টেপলটন গ্রোভের অধিকারিণী, মিস ক্যাস্‌ল সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

ঘাসে ঢাকা সবুজ লন অতি অপূর্ব একসার দেবদারুর গোপনীয়তায় যেখানে প্রবেশ করেছে, যেখানে নিয়ত ঝরাপাতার সভাসমাবেশ, সেই স্থানে রচিত হল শেষ শয্যা। হেমন্তের দ্বিপ্রহর। কোন আড়ম্বর নেই। পাতার ছায়া নরম রোদের বুকে। কফিন আসছে। পেছনে সার বেঁধে আসছেন ছোট্ট একটি দলে বদ্ধ

তাঁর শেষ সঙ্গীরা। যাঁরা তাঁর বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন সেবা আর সাহচর্যে। স্টেপলটন গ্রোভ ও বোডফোর্ড স্কোয়ারের পরিবার পরিজন। শ্রীমতী ক্যাস্‌লের অভিভাবকবৃন্দ, এস্টলিন, কস্টার, ডঃ জেরারড, কয়েকজন মহিলা, রাজারাম, রামমোহনের ভারতীয় সঙ্গীরা।

ধীরে ধীরে, মাটির গভীরে, সবুজের হৃদয়ে, 'এলমের' বাতাসে, পাতার ঐকতানে তাঁর কফিন নামছে। প্রেমিক, মহান, কয়েকজন মানুষ মূর্তির মতো দণ্ডায়মান। ছায়া লুটিয়ে আছে প্রণামের মতো। দুটি পাখির কথোপকথন— অনেকের মাঝে ছিল যে একলা, একের কাছে গিয়ে দেখবে বহুর সভা।

ছোট্ট একান্ত প্রার্থনা—remain in peace under the shade of the elms unmodested by hostile hands,

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি

আপাতত! রাজা! দশবছর পরে শয্যার পরিবর্তন হবে। প্রিনস আসবেন। আপনার বন্ধু দ্বারকানাথ। আরনোস ভেলে অপূর্ব এক সমাধি মন্দিরে আপনি প্রতিষ্ঠিত হবেন। ভারতস্তম্ভ।—

তারপর। আরোহী! কালতুরঙ্গে তুমি কে? আর এক রাজা। এবার গৈরিক বেশ। মাথায় আর এক ধরনের পাগড়ি। দিব্য চক্ষু, দিব্য দেহ। সনাতন ভারতের সনাতন মূর্তি। কলকাতার ব্রাহ্ম মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ শিলায় শাণিত হয়ে, সাকার নিরাকারের রহস্য সমাধান করে এসেছি আমি— নরেন্দ্রনাথ! স্বামী বিবেকানন্দ। মিস ক্যাস্‌ল, মিস্ হেয়ারের মতো, মার্গারেট নোবল! মাস্টার। তুমি অর্থাৎ 'ভারত'! ভারতই গুরু।

———